অগ্রিম বার্ষিক মূল্য } মুকুল কার্য্যালয় { প্রতি সংখ্যা ৵০

লর্ড লিষ্টর।

মুকুল

২০শ বর্ষ। বৈশাখ, ১৩২১। ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

আবার নববর্ষ আসিয়াছে। যাহা সম্মুখে ছিল, তাহা পশ্চাতে পড়িয়াছে, নূতন পুরাতন হইয়াছে, নবতর "নূতন" সম্মুখে আসিয়াছে, এমন করিয়া, কতবার নূতন পুরাতন হইল। এই যে নূতন পুরাতনের খেলা, ইহা বড়ই বিস্ময়কর। নববর্ষের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, সে সব এখন কোথায়? পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিতে গিয়া অনিবার্য্যরূপে আবাহনের দিনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়ে। মানুষ কেবল বর্ত্তমান লইয়া সন্তুষ্ট নয়; মানুষের দৃষ্টি বর্ত্তমানের সীমা লঙ্ঘন করিয়া সম্মুখ ও পশ্চাতে ধাবিত হয়। নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের চিন্তা একদিকে অতীতের প্রতি প্রসারিত হয়, অপরদিকে ভবিষ্যৎকেও স্পর্শ করে। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে লজ্জা, আত্মগ্লানি, অতৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী। নববর্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের সকলকেই বলিতে হয়, যাহা করিবার ছিল করি নাই, যাহা করা উচিত ছিল না, তাহা করিয়াছি। নববর্ষে কত আশা জাগিয়াছিল, কত সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহার কয়টী পূর্ণ হইয়াছে? পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এইরূপ আত্মগ্লানি অনিবার্য্য। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কিছু নাই; বরং ইহা আনন্দের কথা, জীবনের লক্ষণ। মানবের মনুষ্যত্ব এইখানে। আমরা যাহা পাই, যাহা করি, যাহা ধরি, তাহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মাপ হয় না, আমরা যাহা ধরিতে পারি না, যাহা হইতে পারি না, তাহাতেই মনুষ্যত্বের পরিমাণ। যেখানে আত্মতৃপ্তি, যেখানে মানুষ যাহা পাইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেই মৃত্যু; প্রকৃত মনুষ্যত্ব সর্ব্বদাই যাহা পাইয়াছে তাহা ছাড়িয়া যাহা সম্মুখে, যাহা ঊর্দ্ধে, তাহার দিকে ব্যাকুল ও সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ভগবান মানুষকে এমন করিয়া গড়িয়াছেন, যে সে যাহা পাইয়াছে তাহাতে কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না, মানুষের স্থান যতই উচ্চ হউক, তাহার উপার্জ্জন যতই মূল্যবান হউক, তাহার গৃহ যতই ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠুক না কেন, তাহার আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। মানব প্রকৃতিতে এমন এক অসীমতার আবেগ আছে, যাহা কোনও সীমা মানিতে চায় না। আমরা যতদূর দেখিতে পাই, চক্ষু তাহারও পরে যাইতে চায়; আমরা যতটা ধরিতে পারি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। মানবের আদর্শ চিরদিনই আয়ত্তকে অতিক্রম করিবে।

পুরাতন বর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যাহাদের মন ম্লান ও বিষণ্ণ হইতেছে, তাহাদিগকে বলিতেছি, নিরাশ হইও না। দিন, মাস, বর্ষ যদি বিফলে গিয়া থাকে, সংকল্প যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে, প্রতিজ্ঞা যদি চূর্ণ হইয়া থাকে, সংগ্রামে যদি পরাভব হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষতি নাই, যদি অপরাজিত চিত্তে নববর্ষে নূতন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পার। মানবজীবনের সফলতা জয়ে নহে, সংগ্রামে। আমরা যাহা চাই তাহা পাইলেই জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না; অনেক সময় আমরা যাহা

চাই তাহা না পাওয়াতেই মঙ্গল। সুখ, সম্পদ, সফলতা লাভ করিয়া যদি আত্মার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, আর অকৃতকার্য্যতা পরাজয় ও পতনের আঘাতে যদি আত্মার উদ্যমশীলতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বৰ্দ্ধিত হয় তবে তাহা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। উদ্যমহীনতাই ভয়াবহ, আদর্শের হীনতাই নিন্দনীয়, নিরাশাই মৃত্যু! দশবার হারিয়াও যদি বলিতে পারি, আবার সংগ্রাম করিব, শতবার পড়িয়াও যদি আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করি, সেই মনুষ্যত্ব।

আমরা গত বৈশাখে যে গীতে নববর্ষকে আবাহন করিয়াছিলাম, পরে দেখিয়াছি তাহা পালন করা কি দুষ্কর। জানি না, ভগবান বুঝি আমাদিগকে পরীক্ষার জন্যই বোঝা দ্বিগুণ করিয়া দেন। কঠিন হইলেও আদর্শ পরিত্যাগ করিব না, নববর্ষে আবার গাহি,

"এস গো বরষ নব,
মরণের কথা তুলিব না আজ
জীবনের কথা কব;
হারিবার কথা স্মরিব না, জানি
আমরা বিজয়ী হব।
আনন্দ ঘুচাবে যতেক বেদন
জয়, সর্ব্ব পরাভব।"

অজানারে হবে জানিতে।

সেই অজানারে হবে জানিতে
যে পলায় দূরে তারে বিশ্ব ঘুরে
নিজ পুরে হবে আনিতে।
দেখা দিয়া যায় নাহি দেয় ধরা
বিজলীর মত কভু সে প্রখরা
স্বপনের মত বিহ্বলতা ভরা
খেলে এ হৃদয় খানিতে,
তারে ভালকরে হবে জানিতে।
কেউ বলে "ভাই, দেখিবার ভুল"
কেউ বলে "হায় হয়েছে বাতুল!
বাসনা সাগরে কে পেয়েছে কূল?"
নারি কারো কথা মানিতে।
লক্ষ ঢেউ আসি পড়িছে বেলায়,
কোন মায়াবিনী তা'লয়ে খেলায়,
কোথা হতে উঠি, কোথা ফিরে চায়,
কাহার অমোঘ বাণীতে?
তাহারে হইবে জানিতে।

শ্রীকামিনী রায়।

লর্ড লিষ্টর।

তোমাদের মধ্যে কেহ লর্ড লিষ্টরের নাম শুনিয়াছ কিনা জানি না। তাঁহার নাম সাধারণে সুপরিচিত না হইলেও যাঁহারা মানবজাতির মহা কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নামের পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। একজন চিন্তাশীল লোক বলিয়াছেন, যে "যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, উনবিংশ শতাব্দীর কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের চক্ষু জল মোচন করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে উত্তর করিব, তিনি লর্ড লিষ্টর।" লর্ড লিষ্টর অস্ত্রচিকিৎসায় যুগান্তর আনয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কারের পূর্ব্বে শত শত লোক দারুণ যাতনা পাইয়া প্রাণ হারাইতেন। লর্ড লিষ্টর অস্ত্রচিকিৎসার এক নূতন প্রথা আবিষ্কার করিয়া মানবজাতিকে কঠিন যাতনা ও অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন; তিনি জাতিতে ইংরাজ। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে লিষ্টর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা দীর্ঘায়ু বংশ; লিষ্টরের পিতা ৮৪ বৎসর বয়সে, এবং পিতামহ ৯৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শুনা যায়, লর্ড লিষ্টরের পিতামহ ও পিতামহী কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন; কোয়েকার সম্প্রদায় আন্তরিক ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ। লর্ড লিষ্টরের পিতা, Joseph Jackson Lister ধনে ও বিদ্যা বুদ্ধিতে খ্যাতনামা লোক ছিলেন। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখিয়া থাকিবে; এই যন্ত্র দ্বারা, ছোট জিনিস বড় দেখা যায়, দূরের বস্তু নিকটে দেখা

যায়, যাহা চক্ষে দেখা যায় না, তাহা ভাল করিয়া দেখা যায়। লর্ড লিষ্টরের পিতা এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কোন কোন ত্রুটি সংশোধন করিয়া যন্ত্রটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল করেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান এমন কি, সভ্যজগতের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান সভা রয়েল সোসাইটি; লিষ্টরের পিতা এই সভার সভ্য ছিলেন।

সতর বৎসর বয়সে লিষ্টর সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্য শেষ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভারসিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন; তথায় বিশ বৎসর বয়সে বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ঐ কলেজেই চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৫২ খৃঃ অব্দে পঁচিশ বৎসর বয়সে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি, এস, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লিষ্টরের গবেষণাশক্তির পরিচয়, তাঁহার চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সময় হইতেই পাওয়া যায়। ডাক্তার হইয়া লিষ্টর ক্রমাগত ৪০।৫০ বৎসর অস্ত্রবিদ্যা অধ্যাপন ও অস্ত্র চিকিৎসা এই দুই কার্য্যে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে লিষ্টর হাঁসপাতালের ছোট ডাক্তার হন; ১৮৯২ খৃঃ অব্দে বয়সানুসারে তাঁহাকে প্রধান অস্ত্র চিকিৎসকের পদ ত্যাগ করিতে হয়। ছোট ডাক্তারের কাজ ৪।৫ বৎসর করিবার পর তিনি বড় ডাক্তার হন।

লিষ্টর যখন চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, সে সময়ে অস্ত্রচিকিৎসার ফল সাধারণতঃ বড় ভাল হইত না; অস্ত্র প্রয়োগের পর, অনেক লোক, মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ক্ষত স্থানে দুর্গন্ধ ও পুঁজ হইত এবং তাহাতে শরীর সমস্ত বিষাক্ত হইয়া অবশেষে রোগীর মৃত্যু হইত। কঠিন অস্ত্রচিকিৎসার জন্য রোগীরা হাঁসপাতালে আসিত; আর তথায় এই ভীষণ দৃশ্য দেখা যাইত। অস্ত্র প্রয়োগের পর বহুসংখ্যক রোগী অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। হাঁসপাতাল সকলের অবস্থা দেখিয়া, কোন কোন সুবিখ্যাত ডাক্তার, উহা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। ১৮৩০।৩১ খৃঃ অব্দে ক্লোরোফরম ব্যবহার আরম্ভ হয়। তোমরা কেহ কেহ ক্লোরোফরম ঔষধের নাম শুনিয়া থাকিবে। ক্লোরোফরম শুঁকিলে মানুষ অজ্ঞান হয়, তখন দেহের উপর ছুরি বসাইয়া শিরা, মাংস বা অস্থি কাটিলে সে কোন কষ্ট অনুভব করে না। ক্লোরোফরম আবিষ্কারের পূর্ব্বে কাটাকুটি কাজ বেশী ছিল না। বুঝিতেই পার, ছুরির আঘাত কি রকম। কত লোক কাটার নামেই ভয় পায়, যে স্থানে কাটাকুটি হয়, সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করে। যাহাদের উপর অস্ত্র প্রয়োগের আবশ্যক হয়, তাদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, ভাব দেখি। ক্লোরোফরম্ আবিষ্কারের পর, অস্ত্রচিকিৎসার যাতনা চলিয়া গেল; সুতরাং অনেক লোক হাঁসপাতালে অস্ত্র চিকিৎসা করাইতে আসিতে লাগিল। এক দিকে অস্ত্র প্রয়োগের কষ্ট গেল; কিন্তু, অপর দিকে, চিকিৎসার পরিণাম বড় মন্দ হইল। লিষ্টর, অস্ত্র প্রয়োগের ভীষণ পরিণাম দেখিলেন এবং বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার পর, এমন উপায় উদ্ভাবন করিলেন, যাহাতে অস্ত্র চিকিৎসার ভীষণ পরিণাম দূর হইল। এই নূতন পদ্ধতিকে ইংরাজিতে Anti-septic Surgery বলে। এ প্রণালীতে অস্ত্র চিকিৎসা করিলে ক্ষত স্থানে পঁজ হয় না, ক্ষত স্থান সহজে শীঘ্র ভাল হয়। বিনা পুঁজে অস্ত্র দ্বারা ক্ষত স্থান ভাল হয়, লিষ্টরের গবেষণা ও চিকিৎসাপদ্ধতি জগতকে ইহা দেখাইয়া গিয়াছে। লিষ্টরের নিকট জগৎ এই অস্ত্র চিকিৎসা সংস্কারের জন্য বিশেষ ভাবে ঋণী।

স্কটলণ্ড দেশের মহানগরী এডিনবরাতে রয়েল ইনফারমারী নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসালয় আছে। Syme নামে এক জন বিজ্ঞ ও সুনিপুণ ব্যক্তি এই চিকিৎসালয়ের প্রধান অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। লিষ্টর ইঁহার অধীনে এক সময় কাজ করিতেন, এবং তাঁহার দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লিষ্টর, এডিনবরায় অবস্থান কালে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে, ইঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; ইঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই।

লিষ্টরের নাম ও খ্যাতি শীঘ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সভ্য জগৎ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইল। জগতের যত বিখ্যাত বিদ্বজ্জন সভা তাঁহাকে সদস্য করিয়া

আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিল। ইংলণ্ড তাঁহাকে প্রথমে ব্যারণ (Baron) পরে পিয়ার (Peer) করিল; ইহা ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও গৌরব। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সভা রয়েল সোসাইটি তাঁহাকে প্রথমে সদস্য (Fellow), পরে সভাপতি করিয়াছিল। পরে, ৮৫ বৎসর বয়সে ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া) রোগে চারি দিবস মাত্র কষ্টভোগ করিয়া লিষ্টর প্রাণত্যাগ করেন। উনিশ বৎসর পূর্ব্বে লেডি লিষ্টর ও এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইংলণ্ডে দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের জন্য একটি সমাধি ক্ষেত্র আছে; তাহাকে ওয়েষ্টমিনস্টর আবি বলে। এই খানে নিউটন, ডারবিন প্রভৃতির দেহ সমাহিত হইয়াছে। লর্ড লিষ্টরের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মৃত দেহ তাঁহার স্ত্রীর সমাধির পার্শ্বে প্রোথিত করা হইয়াছিল। রাজা ও দেশবাসিগণ লর্ড লিষ্টরের শব পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের পার্শে সমাহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না।

জগতের কল্যাণ সাধন মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। লর্ড লিষ্টর আজীবন মানবের দুঃখ লাঘবের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার পর মৃত্যুকালে তাঁহার চির জীবনের সঞ্চিত অর্থও মানবের হিতের জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, যে মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি নিম্নলিখিত সদনুষ্ঠানে ব্যয় হইবে।

১। রয়েল সোসাইটি (Royal Society) ১৫০,০০০ টাকা।

২। King Edward Hospital Fund (ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান চিকিৎসালয়ে দানের জন্য একটি) ১৫০,০০০

৩। King College Hospital (লর্ড লিষ্টর এই এই চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ছিলেন) ১৫০,০০০

৪। North London Hospital ১৫০,০০০

৫। University College. এই স্থানে লিষ্টরের প্রথম শিক্ষা। ১৫০,০০০

৬। Lister Institute of Preventive Medicines. ৩০০,০০০

শ্রীবিপিনবিহারী সরকার।

দুঃখীরা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিসপের ভগিনী শয়ন করিতে গেলে বিসপ একটী জ্বলন্ত রৌপ্য আলোকদণ্ড আগন্তুকের হস্তে দিয়া অপরটী স্বয়ং লইয়া বলিলেন, "আসুন, আমি আপনাকে আপনার শয়ন কক্ষ দেখাইয়া দিই।"

আগন্তুক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। বিসপের শয়নকক্ষের মধ্য দিয়া অতিথির কক্ষে যাইবার পথ। বিসপ যখন তাহাকে শয়ন গৃহে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন পরিচারিকা বিসপের শয্যার শিয়রের নিকটস্থিত আলমারিতে বাসন রাখিতেছিল। প্রতি রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিচারিকার এই কাজ ছিল। আগন্তুক শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে তাহার শয্যায় এক খানি শুভ্র চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে নিকটস্থিত ছোট টেবিলের উপর হাতের বাতিদানী রাখিল। বিসপ বলিলেন, "আমি আশা করি, আপনার সুনিদ্রা হইবে। কল্য প্রাতঃকালে যাইবার পূর্ব্বে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের গাভীর এক বাটী টাটকা দুধ পান করিয়া যাইবেন।"

আগন্তুক বলিল, "আচার্য্য মহাশয়, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

এই কয়টী কথা শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ তাহার মনে ও মুখে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল। সে সময়ে স্ত্রীলোকেরা সেখানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। সে তখন যাহা বলিয়াছিল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। বিসপকে সাবধান করা কি ভয় দেখান তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বলা যায় না। অথবা ইহা কেবল তাহার প্রকৃতিগত উত্তেজনা মাত্র। যাহা হউক, সে হঠাৎ বিসপের দিকে ফিরিয়া দুই হাত বুকের উপরে রাখিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "আপনি কি সত্য সত্যই আমাকে আপনার এত নিকটে

* ফরাসী গ্রন্থকার ভিক্টর হুগোর Les Miserables নামক গ্রন্থের বালকবালিকাদের উপযোগী বঙ্গানুবাদ।

শুইতে দিবেন?" পরে একটু থামিয়া বিকট হাস্য করিয়া সে আবার বলিল, "আপনি কি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন? কে বলিল, যে আমি নরহত্যাও করি নাই?"

বিসপ উত্তর করিলেন 'সে চিন্তা ভগবানের।" তৎপরে গম্ভীর ভাবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিসপ সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার ওষ্ঠাধর নড়িতেছিল, বোধ হয়, তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন। শয়ন কক্ষের পার্শ্বেই উপাসনা গৃহ। সেখানে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিনের মত জানু পাতিয়া বিসপ অনেক ক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সম্মুখস্থ বাগানে গেলেন এবং সেখানে বেড়াইতে বেড়াইতে আকাশের সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্য এবং হৃদয়ের উচ্চ চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

ততক্ষণে আগন্তুক নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল, যে গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিবার বিলম্বও তাহার সহ্য হইল না। ফুৎকারে আলোক নিবাইয়া সে তাহার শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল এবং পর মুহূর্ত্তেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

নিকটবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়িতে যখন বারটা বাজিল, তখন বিসপ বাগান হইতে আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যে ক্ষুদ্র পরিবারের সকলে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হইলেন।

এইবার আগন্তুকের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার নাম জীন ভালজীন। জীন ভালজীনের পিতা কৃষক ছিল। অল্প বয়সেই তাহার পিতা মাতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল। পৃথিবীতে জীন ভালজীনের আর কেহ ছিলনা। যতদিন তাহার স্বামী জীবিত ছিল, এই ভগিনীই জীন ভালজীনের সকল ভার বহন করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সাতটী সন্তান লইয়া তাহার ভগিনী বিধবা হয়, সন্তানগুলি সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক; সর্ব্বজ্যেষ্ঠের বয়স আট এবং কনিষ্ঠের বয়স এক বৎসর। এই সময়ে জীন ভালজীনের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল। এই বৃহৎ পরিবারের ভার জীন ভালজীনের উপরেই পড়িয়াছিল। তাহার ভগিনী তাহাকে সাহায্য করিত; কিন্তু সাতটী ছোট ছোট সন্তান লইয়া সে বেশী কাজ করিতে পারিত না। জীন ভালজীন ঠিকা মজুরের কাজ করিত। সাধারণতঃ গাছে উঠিয়া ডাল কাটাই তাহার কাজ ছিল, চাষ আবাদের সময় ক্ষেতের কাজ ও সে করিত। সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিয়া সে অতিশয় শ্রান্ত হইত। সকল দিন পর্য্যাপ্ত আহারও তাহার জুটিত না। সে কাহারও সঙ্গে মিশিত না, তাহার কোনও বন্ধু ছিলনা, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ কোমল ও দয়ালু ছিল। তাহাদের এক জন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী ছিল। তাহার ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীরা এক একদিন সেই বৃদ্ধার নিকটে গিয়া তাহাদের মায়ের নাম করিয়া দুধ ধার করিয়া পথে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত। তাহাদের মা জানিতে পারিলে অবশ্য তাহাদিগকে শাস্তি দিত। কিন্তু জীন ভালজীন ভগিনীকে জানিতে না দিয়া গোপনে বৃদ্ধাকে দুধের দাম দিত। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অভাবের মধ্যে জীন ভালজীনের প্রথম জীবন কাটিয়া গেল।

এক বৎসর শীতকালে দেশে অভাব উপস্থিত হইল। জীন ভালজীনের কাও জুটিত না; সুতরাং পরিবারের অন্ন ও জুটিত না। একদিন ঘরে কিছু ছিলনা। সাতটী সন্তানের মুখে সারা দিন কিছু উঠিল না। রাত্রিতে বাজারের রুটী বিক্রেতা দোকানের দ্বার বন্ধ করিয়া যখন শুইতে যাইতেছিল, তখন শুনিতে পাইল, দোকানের পাশের কাচের দেওয়ালে কে যেন আঘাত করিতেছে। তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল, একজন কাচের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ভিতরে হাত প্রবেশ করিয়া দিয়া এক খানি রুটী লইয়া পলাইতেছে। দোকানী তাহাকে তাড়া করিল; চোর যথাসাধ্য দৌড়িতে লাগিল; কিন্তু দোকানী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; সে রুটী ফেলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু কাচে তাহার হাত কাটিয়া রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই চোর জীন ভালজীন। চুরীর অপরাধে জীন ভালজীনের পাঁচ বৎসর কঠিন

পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইল। সে সময়ে দীর্ঘ কালের কয়েদীদিগকে জাহাজে কয়েদ খাটিতে হইত। কয়েদী দিগের পদ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া সারি সারি তাহাদিগকে জাহাজের দাঁড় টানিতে দেওয়া হইত। ১৭৯৬ সালের এপ্রিল মাসে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে জীন ভালজীন জাহাজে প্রেরিত হইল। যখন তাহার গলার কড়া হাতুড়ীর আঘাতে আঁটিয়া দেওয়া হইতেছিল তখন জীন ভালজীন কাঁদিতেছিল; অশ্রুজলে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে ছিল, সে কথা বলিতে পারিতেছিল না, কেবল বলিয়াছিল যে সে কাঠুরিয়ার কাজ করিত। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে ডান হাত তুলিয়া পরে পরে সাতবার ক্রমে ক্রমে হাত নামাইয়া দেখাইয়াছিল, যেন সাতটী ছোট ছোট ছেলের মাথা স্পর্শ করিতেছিল। বোধ হয় সে বলিতেছিল, যে তাহার অপরাধ যাহাই হউক না কেন, সাতটী ক্ষুদ্র শিশুর জীবন রক্ষার জন্য সে সেই অপরাধ করিয়াছে।

যথাসময়ে জীন ভালজীন টুলোঁ বন্দরে নীত হইল। সেখানে লাল কুর্ত্তা পরাইয়া তাহাকে জাহাজে উঠান হইল। এই খানে তাহার অতীত জীবনের সকল স্মৃতি, এমন কি তাহার নাম পর্য্যন্ত মুছিয়া গেল। এখন আর সে জীন ভালজীন নয়, এখন হইতে তাহাকে ২৪৬০১নং বলিয়া ডাকা হইত।

জীন ভালজীনের দিদির কি হইল? তাহার সাতটী সন্তানেরই বা কি হইল? সে খবর কেহই রাখে না। গাছের গুঁড়ি শুকাইয়া গেলে পাতার যে দশা ঘটে, তাহাদেরও সেই দশা ঘটিল। সহায়হীন ও আশ্রয়-হীন হইয়া তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। ক্রমে তাহাদের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। জাহাজে কয়েক বৎসর কারাবাসের পর জীন ভালজীন ও তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

কারাদণ্ডের চতুর্থ বৎসরের শেষের দিকে জীন ভালজীন পলায়নের সুবিধা পাইয়াছিল। সঙ্গীরা তাহার সহায় হইয়াছিল। পলাইয়া সে দুই দিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে ধরা পড়িয়া আবার বন্দী হইল। পলায়নের চেষ্টা অপরাধে তাহার আরও তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। ষষ্ঠ বৎসরে জীন ভালজীন আবার পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু এবারও সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। হাজিরা লইবার সময় তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না; অমনি বন্দুক ছুঁড়িয়া কয়েদীর পলায়ন সংবাদ ঘোষণা করা হইল। রাত্রিতে এক জন প্রহরী তাহাকে এক খানি নূতন জাহাজের নীচে লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়াছিল। প্রহরী তাহাকে ধরিতে গেলে সে বাধা দিয়াছিল; পলায়ন ও বিদ্রোহ অপরাধে জীন ভালজীনের আরও পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইল। দশ বৎসরের সময় সে আবার পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতেও কৃতকার্য্য হয় নাই; লাভের মধ্যে আর তিন বৎসর কারাদণ্ড বাড়িয়াছিল। অবশেষে তের বৎসরের সময় শেষ বার পলাইয়া ৪ ঘণ্টা মুক্ত ছিল, এবং তাহার ফলস্বরূপ আরও তিন বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ উনিশ বৎসর। ১৭৯৬ সালে জীন ভালজীন বন্দী হইয়াছিল; আর ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কারাগারে যাইবার সময় সে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তথা হইতে বাহির হইবার সময় তাহার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন।

জীন ভালজীনের এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী কে? দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগের সময়ে সে আপনি অনেক সময়ে এই বিষয়ে চিন্তা করিত। প্রখর রৌদ্রতাপে শৃঙ্খলিত পদে অনাবৃত মস্তকে কাজ করিতে করিতে, অথবা গভীর রাত্রিতে কাষ্ঠাসনে শয়ন করিয়া জীন ভালজীন আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা অনেক সময় ভাবিত। জীন ভালজীন অশিক্ষিত হইলেও দুষ্ট প্রকৃতি ছিলনা; তাহার বুদ্ধি প্রখর এবং হৃদয় কোমল ছিল। সে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী মনে করিত না। সে আপনার মনে স্বীকার করিত, যে সে অপরাধী। সে স্বীকার করিত, যে দোকান ভাঙ্গিয়া রুটী লওয়া তাহার অন্যায় হইয়াছিল। হয়ত চাহিলে দোকানী তাহাকে এক খানি রুটী দিত। তাহা না হইলেও ক্ষুধা সহ্য করিয়া অপেক্ষা করাই তাহার পক্ষে সঙ্গত ছিল। কিন্তু আবার ভাবিত, অপরাধ

কি কেবল তাহারই? কাজ যে জুটিল না তাহা কাহার অপরাধ? সে সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ, তবু কেন তাহার অন্ন জুটিল না? সারাদিন পরিশ্রম করিয়া কেন উদরান্ন জুটে না? অপর দিকে কত লোক আলস্যে আমোদে দিন কাটায়, কত অর্থ অপব্যয় করে। তাহার পরে এই কঠোর শাস্তি! অপরাধ করিয়াছে স্বীকার করিলেও কি এই কঠোর কারাদণ্ড অন্যায় নয়? এই সকল চিন্তা কারাবাসের কঠোরতার সঙ্গে মিশিয়া জীন ভালজীনের হৃদয়ে মনুষ্য সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্রেক করিত। ক্রমে মনুষ্য সমাজ হইতে মনুষ্য সমাজের বিধানকর্ত্তা ভগবানের প্রতি তাহার ঘৃণা প্রসারিত হইয়াছিল।

টুলোঁ সহরে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা কয়েদীদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। জীন ভালজীন কারাবাসকালে এখানে লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল। ইহাতে তাহার চিন্তা শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিন দিন তাহার মনে মানব, মানবের আইন, মানব সমাজ এবং ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিদ্রোহ তাহার মনে স্থায়ী আকার ধারণ করিল এবং সুবিধা পাইলেই প্রতিহিংসা লইবার জন্য সে দৃঢ়সংকল্প হইল। এইজন্য সে বার বার পলায়নের চেষ্টা করিত। বাঘ যেমন খাঁচার দ্বার উন্মুক্ত দেখিলেই পলাইতে চেষ্টা করে, জীন ভালজীন তেমনি সুবিধা পাইলেই পলাইতে চেষ্টা করিত। স্বভাবতঃই তাহার পলাইবার ইচ্ছা হইত; যদিও চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত, যে পলায়নের চেষ্টা বৃথা, তবু প্রলোভনের সম্মুখে তাহার বিবেচনা শক্তি ভাসিয়া যাইত, বিদ্বেষ বুদ্ধিই জয়যুক্ত হইত। পুনর্ব্বার বন্দী হওয়ার পর কারাবাসের দ্বিগুণিত কঠোরতায় তাহার অন্তরের রোষ ও বিদ্বেষ শতগুণে বর্দ্ধিত হইত।

নিরন্তর পলায়নের উপায় চিন্তায় তাহার শারীরিক ও মানসিক, শক্তির আশ্চর্য্য বিকাশ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে জীন ভালজীনের শরীরে অমানুষিক বল ছিল। চারিজন লোকে যে বোঝা তুলিতে পারিতনা, সে একাকী অক্লেশে তাহা বহন করিতে পারিত। অনেক সময়ে জীন ভালজীন অত্যন্ত ভারী বোঝা পিঠে ধরিয়া রাখিত। একবার একটা খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল; জীন ভালজীন তাহাতে ঠেস দিয়া মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ক্ষিপ্রহস্ততা শারীরিক বল অপেক্ষা বিস্ময়কর ছিল। খাড়া দেওয়াল বাহিয়া উঠা, যেখানে পা রাখিবার স্থান নাই এমন স্থানে আরোহণ, তাহার পক্ষে খেলার মত হইয়াছিল। একটু দেওয়ালের কোণ পাইলে সে হাতে ও পায়ে ভর দিয়া তাহা বাহিয়া অনায়াসে ত্রিতল গৃহের ছাদে উঠিতে পারিত। জীন ভালজীন সাধারণতঃ কাহারও সঙ্গে কথা কহিত না এবং কখনও তাহাকে হাসিতে দেখা যাইত না। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, সে যেন কোন ভয়ঙ্কর পদার্থের দিকে চাহিয়া আছে। সর্ব্বদাই সে কি এক চিন্তায় মগ্ন থাকিত, বাস্তব জগৎ তাহার নিকট কল্পনা মনে হইত। এই ভাবে উনিশ বৎসর কাটাইয়াছিল। এই দীর্ঘ কালের পর তাহার হৃদয় শুষ্ক, কঠোর এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। যে দিন সে কারাগৃহে প্রবেশ করিল, সে দিন হইতে উনিশ বৎসরের মধ্যে তাহার চক্ষে জল দেখা যায় নাই।

যে দিন তাহার কারাবাস সমাপ্ত হইল এবং তাহার কাণে "তুমি এখন মুক্ত" এই অপরিচিত শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল, তখন প্রথমতঃ তাহা অসম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইল। তাহার পর তাহার জীবনে আবার আশার রশ্মি পতিত হইল; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহা ম্লান হইয়া গেল। মুক্তির নামে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল, সে কেমন মুক্তি। সে হিসাব করিয়াছিল, যে কারাগারের কাজ করিবার জন্য তাহার ১৭১ ফ্রাঙ্ক পাওনা হইয়াছে, কিন্তু রবিবার ও মাঝে মাঝে যে দুই এক দিন কাজ বন্ধ ছিল, তাহার হিসাব সে বাদ দেয় নাই। কারাগার

হইতে বাহির হইবার সময় তাহাকে ১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ সু মাত্র দেওয়া হইল; জীন ভালজীন এই হিসাব বুঝিল না, সে মনে করিল, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইল।

মুক্তির পর দিন পথে এক সহরে সে দেখিল, যে এক দোকানের সম্মুখে গাড়ী হইতে মোট নামান হইতেছে। সে সেই কাজ করিতে চাহিল, শীঘ্র গাড়ী খালি করিবার প্রয়োজন ছিল, সেই জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ তাহাকেও কাজে নিযুক্ত করিল। জীন ভালজীন সঙ্গের এক জন মজুরকে মজুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, যে দিন ৩০ ফ্রাঙ্ক করিয়া মজুরী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন সে কাজ করিতেছিল একজন পুলিশ প্রহরী আসিয়া তাহার পাস দেখাইতে বলিল। জীন ভালজীন বাধ্য হইয়া জেলখানার হরিদ্রাবর্ণ পাসটি দেখাল। সন্ধ্যাকালে সে যখন মজুরী চাহিল, কার্য্যাধ্যক্ষ তাহাকে ১৫ ফ্রাঙ্ক মাত্র দিল। জীন ভালজীন যখন তাহাতে আপত্তি করিল, তখন কার্য্যাধ্যক্ষ ধমক দিয়া বলিল "তোমার আবার জেলে যাইবার ইচ্ছা আছে?" জীন ভালজীন চুপ করিল, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, আমার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইল। মনের এই প্রকার অবস্থা লইয়া সে ডি—সহরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পরে যাহা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

গির্জ্জার ঘড়িতে যখন দুইটা বাজিল তখন জীন ভালজীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ১৯ বৎসর সে কাঠের উপরে শুইতে অভ্যস্ত; কোমল শয্যায় শয়নের অনভ্যস্ত সুখে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। চারি ঘণ্টার অধিক সে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহাতেই তাহার শরীরের ক্লান্তি দূর হইয়াছিল। স্বভাবতঃ জীন ভালজীন বেশী নিদ্রা যাইত না। ঘুম ভাঙ্গিলে জীন ভালজীন চারিদিকের অন্ধকারে চক্ষু মেলিয়া দেখিল ও তৎপরে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যে দিন বিবিধ চিন্তায় মন আলোড়িত হয়, সে রাত্রিতে বরং ঘুম আসা সহজ, কিন্তু একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, আবার ঘুমান কঠিন। জীন ভালজীনের ও তাহাই হইল তাহার আর নিদ্রা আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে একটীর পর একটী করিয়া নানা চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে চঞ্চল করিতে লাগিল। পুরাতন ও নূতন স্মৃতিতে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন ঢেউ খেলিতেছিল। ক্রমে সকল চিন্তার মধ্যে এক চিন্তা প্রবল হইয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। সে চিন্তা এই রাত্রিতে আহারের সময় পরিচারিকা যে ছয় খানি রৌপ্য চামচ ও কাঁটা এবং এক খানি বৃহৎ প্লেট টেবিলের উপরে রাখিয়াছিল, সে তাই দেখিয়াছিল। এই প্লেটের চিন্তা তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। কয়েক হাত দূরেই তাহা রহিয়াছে। শয়ন কক্ষের পথে সে যখন পাশের ঘরের ভিতর দিয়া আসিতেছিল, তখন পরিচারিকা তাহা দেওয়ালের গায়ে একটী আলমারিতে রাখিতেছিল। জীন ভালজীন তাহা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল। খাবার ঘর হইতে আসিবার পথে ডান দিকে সেই আলমারী। প্লেট খানি খুব বড় এবং ভারী। তাহার মূল্য অন্ততঃ ২০০ ফ্রাঙ্ক হইবে অর্থাৎ কারাগারে ১৯ বৎসরে সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে প্রায় তাহার দ্বিগুন!

পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল জীন ভালজীনের মন এই সকল চিন্তায় আন্দোলিত হইয়াছিল। যখন তিনটার ঘণ্টা বাজিল, তখন সে চোখ খুলিল, এবং হঠাৎ উঠিয়া খাটের পাশে বসিয়া পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিল। এই অবস্থায় চিন্তা মগ্ন হইয়া সে অনেক ক্ষণ বসিয়াছিল। তখন যদি কেহ তাহাকে দেখিত, তাহার মুখে এক প্রকার ভীতি জনক ভাব দেখিতে পাইত। কিন্তু তখন সে বাড়ীতে কেবল এক মাত্র সেই জাগ্রত ছিল। খানিক পরে হঠাৎ সে মাথা নোয়াইয়া পায়ের জুতা খুলিল; তারপরে অবার পূর্ব্বের মত বসিয়া চিন্তামগ্ন হইল। হয়ত এই ভাবেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত; কিন্তু সেই সময়ে ঘড়িতে সিকি ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টার ঘণ্টা বাজিল। সেই শব্দ যেন তাহার কানে কানে বলিল "কাজ আরম্ভ কর।" জীন ভালজীন উঠিয়া দাঁড়াইল, কিয়ৎক্ষণ মনোযোগ দিয়া শুনিল, চারি দিক নিস্তব্ধ। পা টিপিয়া টিপিয়া সে জানালার নিকটে গিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, আকাশে পূর্ণচন্দ্র,

কিন্তু বাতাসে বিচ্ছিন্ন মেঘ খণ্ড থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। জানালার নীচেই বাগান; জীন ভালজীন মনোযোগে সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, যে বাগানের চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা, কিন্তু তাহা বেশী উচ্চ নয়, অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করা যায়। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীর অগ্রভাগ দেখা যাইতেছিল। তাহা হইতে জীন ভালজীন অনুমান করিল যে প্রাচীরের পাশ দিয়া সদর রাস্তা গিয়াছে।

মনোযোগ পূর্ব্বক বহির্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীন ভালজীন আবার তাহার শয্যা পার্শ্বে ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার ব্যাগ খুলিয়া কি একটা জিনিস বাহির করিয়া বিছানার উপরে রাখিল। পায়ের জুতা খুলিয়া কোটের পকেটে রাখিল, মাথায় টুপি পরিল, ঘাড়ে ব্যাগ লইয়া লাঠি হাতে জানালার নিকটে গিয়া সেখানে তাহা রাখিল। শেষে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বিছানার উপরে যে জিনিসটী রাখিয়াছিল তাহা হাতে তুলিয়া লইল। সেটী একটী লৌহ শলাকার মত, তাহার এক প্রান্ত তীক্ষ্ণধার; রাত্রির অন্ধকারে সেটী কি তাহা ঠিক বুঝা যাইতে ছিলনা; কিন্তু দিবসে দেখিলে বুঝা যাইত, যে সেটী পাহাড় খুদিবার অস্ত্র। সেই সময়ে কয়েদীদিগকে কখনও কখনও টুলোঁ সহরের সন্নিহিত পাহাড় কাটিয়া পাথর বাহির করিতে নিযুক্ত করা হইত। জীন ভালজীন সেই অস্ত্র খানি হাতে লইয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে পার্শ্বের কক্ষে যেখানে বিশপ নিদ্রিত ছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারের নিকটে আসিয়া সে দেখিল যে দ্বার খোলা আছে; বিসপ ঘরের দ্বার বন্ধ করেন নাই।

দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া জীন ভালজীন কাণ পাতিয়া শুনিল, কোথাও কোনও শব্দ নাই। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মৃদু হস্তে সে একখানি কপাট একটু ঠেলিল, নিঃশব্দে কপাট একটু সরিয়া গেল, তখন সাহস পাইয়া সে আরও জোরে দরজা ঠেলিল; কিন্তু এইবার কপাট সরিয়া জোরে শব্দ হইল। জীন ভালজীন চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে সেই শব্দে বাড়ীর সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার কপালের শিরায় দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল তাহার মনে হইল, যে আর তাহার বাঁচিবার আশা নাই। জীন ভালজীন পাথরের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার নড়িবারও শক্তি ছিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাহার ভয় দূর হইল; তখন সে সাহস করিয়া ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিল যে কেহ নড়েও নাই। জীন ভালজীন কক্ষের অপর প্রান্ত হইতে বিশপের গাঢ়নিদ্রাসূচক স্থির নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে সাবধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। হঠাৎ সে থামিয়া দাঁড়াইল, দেখিল যে সে একেবারে বিশপের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে একখানি মেঘ যাহা প্রায় আধঘণ্টা চাঁদের মুখ আবৃত করিয়াছিল, হঠাৎ সরিয়া গেল, এবং চন্দ্রের আলোক আসিয়া বিশপের গভীর পাণ্ডুপূর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। একখানি কম্বলে তাঁহার দেহ আবৃত ছিল; বালিসের উপরে তাঁহার মস্তক শান্তভাবে অবস্থিত ছিল; মুখে এক অপার্থিব শান্তির ছায়া। চাঁদের আলো, চারিদিকের নিস্তব্ধতা, প্রকৃতির শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য্য, এই সকল মিলিয়া তাঁহার সেই সুপ্ত মুখশ্রীতে এক স্বর্গীয় জ্যোতি ঢালিয়া দিয়াছিল। জীন ভালজীন দেওয়ালের আড়ালে অন্ধকারে সিঁদকাটি হস্তে শয্যাপার্শ্বে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কখনও এমন শান্ত দৃশ্য দেখে নাই; এই সাধুপুরুষের নির্ম্মল মুখশ্রী তাহার অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব ভীতি সঞ্চার করিতেছিল। উদ্রিক্ত বিবেকের আলোড়নে অস্থির একটী আত্মা পাপাচরণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন সাধুপুরুষের শান্তিপূর্ণ প্রগাঢ় নিদ্রা দেখিয়া স্তব্ধ! মুগ্ধ রহস্যময় নৈতিক জগতের ইহা অপেক্ষা রহস্যপূর্ণ দৃশ্য বিরল।

(ক্রমশঃ)

ভাগ্য পরিবর্ত্তন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত অক্সফোর্ড সায়ারের নানা সুগন্ধ পুষ্পপূর্ণ উদ্যান সংলগ্ন এক বৃহৎ অট্টালিকায় সার্ হ্যারি লি বাস করিতেন। তাঁহার লিও নামে এক বৃহদাকার কুকুর ছিল। তাহার গম্ভীর ডাক শুনিলে পল্লীর সকলেই ভয় পাইত। সকলে বলিত, যে সে কখনও ঘুমায় না। যখন লিও বাড়ীর বৃহৎ ফটকের সম্মুখে সিঁড়ির উপর শুইয়া থাকিত, তখন দূরে কোন পদশব্দ হইলে সে তৎক্ষণাৎ সজাগ হইয়া মাথা তুলিয়া ও কাণখাড়া করিয়া অপরিচিত লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিত। যদি কেহ কোন মন্দ উদ্দেশ্যে সন্তর্পণে চলাফেরা করিত, সে লিওর চক্ষু এড়াইতে পারিত না; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এমন সতর্ক গৃহপরক্ষা কুকুর তাহার প্রভুর স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সার হ্যারি শীকার করিতে ভালবাসিতেন; সুতরাং যে সকল কুকুর তাঁহার শীকারের সাহায্য করিত, তাহারাই তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি লিওর দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না, কারণ লিও শীকারী ছিল না।

যখন লিওর প্রভু বেড়াইতে যাইতেন, তাহার খুব ইচ্ছা হইত, যে সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, কিন্তু সার্ হ্যারি তাহাকে কখনও ডাকিতেন না, সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজেই সমস্ত সময় কাটাইত, তাহার প্রভুও গৃহরক্ষা ভিন্ন তাহার নিকট আর কিছু প্রত্যাশা করিতেন না। সতর্ক ভাবে পাহারা দিয়া সে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করে মাত্র, ইহার জন্য তাহাকে আদর করিবার আবশ্যক কি?

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ভৃত্য তাহাকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য দিয়া যাইত। প্রভু তাহার কোন সংবাদ লন না বলিয়া ভৃত্যেরা তাহার বিশেষ যত্ন করিত না। হতভাগ্য শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, রৌদ্র বৃষ্টি তুষার অগ্রাহ্য করিয়া প্রভুর মঙ্গল চেষ্টায় রত থাকিত, কিন্তু এত কষ্টের পুরস্কার স্বরূপ প্রভুর এক বিন্দু স্নেহও সে লাভ করিতে সমর্থ হইল না। প্রভু তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং স্বল্প গুণ বিশিষ্ট কুকুরগুলিকে আদর করিতেছেন দেখিলে তাহার প্রাণ প্রভুর স্নেহপূর্ণ কথা শুনিবার জন্য আকুল হইত, কিন্তু দরিদ্রের ইচ্ছা মনে উদিত হইয়া যেমন মনেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার আদর পাইবার ইচ্ছাও উদিত হইয়াই মনে লয় পাইত।

তাহার পর এক রাত্রির এক ঘটনায় লিওর দুঃখ রজনীর অবসান হইল এবং তাহাতেই সে প্রভুর প্রিয় ও তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইল। তখন শীতকাল। সার হ্যারি রাত্রি এগারটার সময় শয়ন করিতে যাইতেছিলেন, লাইব্রেরীর দরজা খুলিতেই দেখিলেন, লিও সম্মুখে শুইয়া রহিয়াছে। প্রভুকে দেখিয়া লিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য নানারকম শব্দ করিতে লাগিল। সার হ্যারি বিরক্তির সহিত তাহাকে ছাড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। লিও তাঁহার পশ্চাতে চলিল। শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া সার হ্যারি দেখেন, লিওও সেইখানে। তিনি তাহাকে তাড়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়া বলিলেন, "যাও।" লিও কিন্তু ঘরের বাহিরে দরজার সম্মুখে শুইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল এবং প্রস্তরের মেজের উপর সশব্দে লেজ আছড়াইতে লাগিল।

সার হ্যারি দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ইটালী হইতে এণ্টোনিও নামে একজন ভৃত্য আনিয়াছিলেন। প্রভু তাহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন। এণ্টোনিও প্রভুর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে লাগিল, প্রভু তাহাকে বলিলেন "কুকুরটা ভারি বিরক্ত করিল। কাল ওর চাকরকে বলিও, যেন রাত্রিতে ওকে বেঁধে রাখে। নীচে যাইবার সময় তুমি ওকে সঙ্গে লইয়া যাইও।"

এণ্টোনিও বলিল, "যে আজ্ঞা"। ইহা বলিয়া সে প্রভুর শয্যাগৃহ ঠিক করিয়া চলিয়া গেল। লিওকে ঘরের বাহিরে দেখিয়া ভৃত্য তাহাকে শিষ দিয়া ডাকিল কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। তখন এণ্টোনিও তাহার গলার বকলস ধরিয়া টানিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু কুকুরের হাঁ দেখিয়া ও তাহার ডাক শুনিয়া

বুঝিল, সে ইহার সঙ্গে বেশী জোর করিতে গেলে ফল ভাল হইবে না। তখন সে মনে করিল, রন্ধনশালা হইতে এক খণ্ড মাংস আনিয়া তাহাকে ভুলাইয়া নীচে লইয়া গিয়া একটা ঘরে বন্ধ করিবে।

এণ্টোনিও চলিয়া যাইবামাত্র লিও তাহার প্রভুর শয়ন গৃহের দরজা আঁচড়াইতে লাগিল। সার হ্যারি ভাবিলেন, এণ্টোনিও তাঁহার কথা শুনিল না, কুকুরকে নীচে লইয়া গেল না, বিরক্ত হইয়া তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন, তখন লিও ঘরে প্রবেশ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিল, তাহাব অস্থিরতা কোথায় চলিয়া গেল। লিও প্রভুর শয্যার তলে গিয়া শুইয়া রহিল। সার হ্যারি যখন দেখিলেন, যে কুকুর আর কোন উপদ্রব করিতেছে না, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে শুইলেন আর তাহাকে শয্যার নিকট হইতে আর তাড়াইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে এণ্টোনিও একখণ্ড মাংস লইয়া উপরে আসিয়া কুকুরটিকে কোথাও না দেখিয়া মনে করিল, সে নীচে তাহার নির্দ্দিষ্ট কুঠরীতে চলিয়া গিয়াছে।

সে রাত্রিতে কুকুরটা ঘরে থাকাতে কিম্বা অন্য কোন কাবণে সাব হ্যারির অনেকক্ষণ অবধি নিদ্রা হইল না। যখন ঘড়ীতে একটা বাজিল তখনও তিনি সজাগ। ঘর গরম রাখিবার জন্য এক কোণে আগুণ জ্বলিতেছিল, তিনি সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন কুকুরকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল। রাত্রি দুইটার সময় তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। এক জন যে ধীরে ধীরে তাঁহার ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি তাহা টের পাইলেন না। সে শয়নগৃহের দরজা সাবধানে খুলিয়া ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার এক মুহূর্ত্ত পরেই শয্যা তলে ঝটাপটির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল, কুকুর চোরকে মেজের উপর ফেলিয়া তাহাকে চাপিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ সার হ্যারির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি লম্ফ দিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া আলো জ্বালাইলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এণ্টোনিও শয়নাবস্থায় শাণিত অস্ত্র লুকাইতেছে এবং কুকুর দন্ত বাহির করিয়া তাহাকে কামড়াইতে যাইতেছে। তখন সারহারি লিওকে তাঁহাব নিকটে ডাকিলেন। সে অনিচ্ছায় এণ্টোনিওর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রভুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। সার হ্যারি তখন এণ্টোনিওকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন এমন সময়ে ওরূপ ভাবে তাঁহার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে? কিন্তু এণ্টোনিও তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনিয়া বাড়ীর সকল চাকর সে স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া এণ্টোনিও আরও ভীত হইয়া অসংলগ্ন ও অর্থ শূন্য কথা বলিতে লাগিল। তখন সত্য কথা জানিবাব অন্য উপায় নাই দেখিয়া সার হ্যারি তাহাকে থানায় প্রেরণ করিলেন।

বিচারকের সম্মুখে এণ্টোনিও তাহার অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে স্বীকার করিল, যে প্রভুকে হত্যা করিয়া তাঁহার প্রচুর ধন চুরির উদ্দেশে সে তাঁহার গৃহে গিয়াছিল, কিন্তু কুকুরেব জন্য তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

এই ঘটনার পর লিও তাহার প্রভুর স্নেহ পাইবার অধিকারী হইল। সার হ্যাবি লিব বংশধর আবল অফ লিকফিল্ডের বাটীতে যে কক্ষে পরিবারের সকলের তৈল চিত্র রক্ষিত আছে, সেখানে কুকুরটীর মাথায় হাত দিয়া হারি দণ্ডায়মান শোভা পাইতেছে, এইরূপ ভাবের একখানা ছবি নীচে লিখিত আছে,

"যত না প্রিয় ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত ছিল।"

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

ভুল বিচার।

আমার দাদামহাশয় সবজজ্ ছিলেন। সরলতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। বয়সে প্রবীণ হইলেও সরলতায় তিনি বালকের মত ছিলেন। এইসরলতার জন্য তাঁহার চরিত্রের দুই দিক প্রকাশ পাইত। একটী দোষের দিক, আর একটী গুণের দিক। দোষের দিক

এই ছিল যে, তিনি লোকের কথায় হঠাৎ বিশ্বাস করিতেন এবং বিনা বিচারে সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতেন। ইহাতে অনেক সময়ে লোকের উপর অবিচার করিতেন। আবার তাঁহার গুণের দিকটা ছিল এই যে, তাঁহার ভুল কেহ ধরিয়া দিতে পারিলে, যখন তিনি সেই ভুল বুঝিতে পারিতেন, তখন অকপটে তাহা শোধরাইয়া লইতেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হইতেন।

অতি শৈশবে আমার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে আমি দিদিমার নিকটেই মানুষ হই। দাদামহাশয় আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। বিশেষতঃ আমার মা তাঁহার একমাত্র কন্যা; আর আমিও মায়ের একমাত্র সন্তান। সুতরাং দাদা মহাশয় স্বভাবতঃ আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন।

একবার তিনি মজঃফরপুরে চারি বৎসর ছিলেন। তখন আমার বয়স ১২।১৩ বৎসর। আমরা সেখানে থাকিতে আর একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের পাড়ায় একখানা বাড়ী কিনিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। তিনি একজন বিশেষ শিক্ষিত জমিদার ছিলেন। তাঁহার স্বভাব গম্ভীর ছিল। তিনি কাহারো সঙ্গে বেশী মিশিতেন না; সর্ব্বদা পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, আর মধ্যে মধ্যে বাড়ীর সংলগ্ন ফুলের বাগানে কাজ করিতেন। স্বহস্তে কাজ করিয়া তিনি ফুলের বাগানটী অতি পরিপাটী করিয়াছিলেন।

একদিন আমি চাকরের সঙ্গে তাঁহার সেই বাগানে গোলাপ ফুল তুলিতে যাই। তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে "তোমরা গোলাপ ফুলগুলি তুলিও না"। আমরা তাঁহার কথায় ফুল না তুলিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমার সঙ্গের চাকরটী বাড়ীতে আসিয়া সেই কথা দাদা মহাশয়ের নিকট বাড়াইয়া বলিয়া দিল। চাকরের কথা শুনিয়া তিনি সেই ভদ্রলোকের উপর অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মত লোকের নাতিকে ফুল তুলিতে দেওয়া হয় নাই, এটা বড় অপমানের কথা, চাকরের মুখে এইরূপ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিনপরে আমাদের একটী চাকর অন্য এক চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আমাদের চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পরদিন খবর পাওয়া গেল যে, সে ব্যক্তি ঐ জমীদার বাবুর বাড়ীতে কাজ করিতেছে। এক জন প্রতিবেশী আসিয়া দাদামহাশয়কে বলিল "দেখলেন মশায়! এ লোকটী কি রকম লোক। সেদিন আপনাকে অপমান কল্লেন, আজ আবার আপনার চাকরটীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেলেন'। এই কথা শুনিয়া দাদামহাশয় আরও অপমানিত বোধ করিয়া তাঁহার উপর দ্বিগুণতর বিরক্ত হইলেন। কেবলমাত্র বিরক্ত হওয়া নয়, তিনি সমস্ত লোকের নিকট সেই কথা বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন গেল। একদিন সেখানকার একটী মুনসেফ বাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার পাড়ার জমীদার বাবুটী কেমন লোক?"

দাদামহাশয় বলিলেন "আর মশায়, সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। উনি এ পাড়ায় আসা অবধি আমরা বড় অশান্তিতে আছি। অমন লোক পাড়ায় না থাকাই ভাল।" মুনসেফ বাবু বলিলেন "কেন, কি হইয়াছে?" দাদা মহাশয় বলিলেন "কত কথা বলব? তিনি ভারি অভদ্র লোক। আর এত অভিমানী যে, কারো সঙ্গে মিশ্‌তে বড় অপমান বোধ করেন। আবার কথায় কথায় অন্যকে অপমানিত করেন। এই দেখুন না, সেদিন আমার নাতি তাঁর বাগানে একটী গোলাপ ফুল তুলতে গিয়েছিল, তিনি ফুলতো দিলেনই না, অধিকন্তু তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার সেদিন আমার এক পুরাণ চাকরকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছেন। লোকটী আবার কৃপণের শেষ। সেদিন পাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলবে ব'লে কিছু চাঁদা চাহিতে গেল, তিনি তাদের একটী পয়সাও দেন নি।"

এই রকম কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে সেই জমিদার বাবুটীর চাকর ফুটন্ত ফুল সমেত একটী গোলাপের গাছ টবে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। দাদামহাশয় বলিলেন "এ কি?" সে লোকটী বলিল "আজ্ঞে, আপনার নাতি বাবু সেদিন আমাদের বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। তখন ফুল ফোটেনি। সেই কুঁড়িগুলি এখন ফুটেছে। তাই আমার বাবু আপনার নাতির জন্য ফুল সমেত এই গাছটী পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

এই কথা হইতেছে, এমন সময়ে আমাদের সেই পুরাতন চাকরটী সেখানে আসিয়া দাদামহাশয়কে এক খানা চিঠি দিয়া বলিল, "হুজুর আমি আপনার বাড়ী ছেড়ে গিয়ে ভাল করিনি। এখন আমার রাগ গিয়েছে, ঐ বাড়ীর জমিদার বাবুটী এই কয়দিন আমাকে তার বাড়ীতে রেখে অনেক বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি আবার আপনার এখানে কাজ করবো।" দাদামহাশয় চিঠি পড়িয়া দেখিলেন যে, তিনিই ঐ চিঠি দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে আমাদের ক্লাশের একটী ছাত্র আসিয়া আমাকে খবর দিল যে, আমরা ঐ জমিদার বাবুর নিকট চাঁদা চাহিয়া কিছুই পাই নাই, কিন্তু তিনি একটী নূতন ফুটবল কিনিয়া হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ইহা দেখিয়া মুনসেফ বাবু বলিলেন "এইতো আপনি এখনি তাঁর কত নিন্দে কচ্ছিলেন। এখন দেখুন তিনি কত ভাল কাজ করেছেন।"

দাদামহাশয়ের ভুল চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন "তাইতো! আমি দেখছি সবই ভুল বুঝেছিলাম।" তিনি নিজের ভুল বিশ্বাসের জন্য এত দুঃখিত হইলেন যে, তখনই সেই জমিদার বাবুর বাড়ীতে গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন উভয়ে মিলন হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস।

গাছের যত্ন।

সচরাচর আমরা যে মাটী দেখিতে পাই তাহা বালি ও কাদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। অণুবীক্ষণ দিয়া মাটীর কিছু গুঁড়া পরীক্ষা করিলে মনে হয়, যেন কতক গুলি পাথরের টুকুরা দেখিতেছি। কতকগুলি ভাঙ্গা ইঁটের রাশির মধ্যে যেমন ফাঁক থাকে, মাটীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলির মধ্যেও সেইরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি বাতাস ও জলে পরিপূর্ণ। বর্ষার সময়ে এই ছিদ্র দিয়া বৃষ্টির জল মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে. আবার বর্ষার অবসানে অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মকালে এই ছিদ্র পথেই নীচে হইতে ক্রমাগত জল উপরে উঠিয়া আসে ও বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। ছিদ্র দিয়া যে জল নীচে নামিতে পারে তাহা তোমরা সহজেই বুঝিবে, কিন্তু নীচে হইতে জল উপরে উঠার কথা তোমাদের হয়ত আশ্চর্য্য লাগিবে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া জল কেন উপরে উঠে, ইহার কারণ তোমরা বড় হইলে শিখিবে।

বর্ষাকালে কূপের জল ভূপৃষ্ঠের কত কাছে আসে; আর শীত ও গ্রীষ্মকালে কূয়ার জল ক্রমশঃ নামিয়া যায়, কূয়াগুলি তখন অনেক বেশী গভীর মনে হয়। শীত বা গ্রীষ্মকালে যদি একটী নূতন কূপ খনন করা যায় তবে প্রথম প্রথম শুষ্ক মাটী পাওয়া যাইবে, ক্রমেই মাটী অল্প অল্প ভিজা লাগিবে, আরও নীচে খুব ভিজা মাটী দেখা যাইবে, তার পরে জল। যেখানে জল পাওয়া যাইবে, সেখানে বা তারও নীচের মাটীতে বাতাস নাই, সেখানকার মাটির ছিদ্রগুলি কেবল জলে পরিপূর্ণ। তাহার উপরে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ছিদ্রগুলিতে জল ও বায়ু উভয়ই আছে। যত উপরে ততই বায়ু বেশী ও জল কম।

জল যে গাছের জন্য কত প্রয়োজন, তাহা তোমাদিগকে বলিতে হইবে না। কত সময়ে বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হইয়া গিয়া দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এইরূপ শুষ্ক বৎসরে যদিও ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি ছোট ছোট গাছ মরিয়া যায় কিন্তু আম কাঁটাল বট অশ্বথ প্রভৃতি বড় বড় গাছ মরে না। তাহার কারণ বড় বড়

গাছের মূল মাটীর অনেক নীচে পর্য্যন্ত নামে এবং উপরিভাগের মাটী শুকাইলেও নীচের মাটীতে যে জল বা রস থাকে সেই রস তাহাদিগকে জীবিত রাখে। মূল বা শিকড় দিয়া জল গ্রহণ করে বলিয়া বৃক্ষলতার একটী নাম পাদপ অর্থাৎ তাহারা পা দিয়া রস পান করে।

প্রত্যেক গাছের মূলের অগ্রদেশে কতকগুলি অতি কোমল ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশ থাকে, তাহাদেরই সাহায্যে গাছ মাটী হইতে রস আহরণ করে। বড় বড় গাছের যে মোটা মোটা শিকড় দেখা যায়, সেগুলি কেবল গাছকে মাটীতে শক্ত করিয়া ধরিয়া খাড়া রাখে, তাহারা মাটীর রস আহরণ করিতে অসমর্থ। মোটা মোটা শিকড়গুলি ক্রমে বহুভাগে বিভক্ত ও সরু হইয়া যায় ও তাহাদের অগ্রভাগে মূলকেশ দৃষ্ট হয়। এই মূলকেশ বিশিষ্ট অগ্র-ভাগগুলি অনেক সময়ে বৃক্ষের কাণ্ড হইতে অনেক দূরে থাকে। এরূপ গাছে যদি জল সেচন করা আবশ্যক হয় তবে গোড়ায় জল ঢালা বৃথা। জল দেওয়া উচিত যেখানে মূলকেশ আছে সেইখানে, নতুবা গাছ সে জল গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু মাটীর মধ্যে ঠিক কোথায় মূলকেশ আছে তাহা উপর হইতে আন্দাজ করা অসম্ভব। মোটামুটী ধরা যাইতে পারে, যে যেখানে গাছের ডাল পালার শেষ তাহার নীচেই গাছের শিকড়েরও শেষ, অর্থাৎ সেইখানেই মূলকেশ। আম লিচু প্রভৃতি কলমের গাছে জল দিতে হইলে গাছের গুঁড়িকে কেন্দ্র করিয়া মাথার উপরে যতদূর পর্য্যন্ত ডাল-পালা আসিয়াছে সেইখানে মাটীতে একটী জুলি কাটিয়া জল দেওয়া উচিত।

জল যেমন বৃক্ষজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন বায়ুও সেইরূপ অত্যন্ত প্রয়োজন। জীব জন্তুর ন্যায় গাছ-পালাও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে। তবে মানুষ গরু ঘোড়া প্রভৃতির যেমন নিশ্বাসের ফুসফুস নামক একটী বিশেষ যন্ত্র আছে আমগাছ বা কাঁটাল গাছের তাহা নাই। এই ফুসফুসের সাহায্যে জন্তুদের দেহমধ্যস্থ দূষিত রক্ত ক্রমাগত শোধিত হইতেছে এবং হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে ঐ পরিষ্কৃত রক্ত সর্ব্বদেহে সঞ্চালিত হইতেছে। বৃক্ষলতার এইরূপ রস সঞ্চালনের ও নিঃশ্বাসের যন্ত্রের অভাবে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে বায়ু লাগা প্রয়োজন। বৃক্ষের শাখাপল্লব ফুলফল ত বায়ুর মধ্যেই ডুবিয়া থাকে কিন্তু মাটীর মধ্যে যে মূল থাকে সেখানেও বায়ু অত্যন্ত আবশ্যক। সচরাচর মাটীর মধ্যে যে বায়ু থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি কখন অতিবৃষ্টি বশতঃ মাটীর ছিদ্র জলে পূর্ণ হইয়া যায় ও বায়ুহীন হয় কিম্বা বন্যার জল জমিতে বাধিয়া মাটীর মধ্যে বায়ুর চলাচল রুদ্ধ করে, তবে অধিকাংশ গাছই মরিয়া যায়। কিন্তু আমন বা শাল ধানের কথা স্বতন্ত্র। ইহার জমিতে জলই চাই। যেমন জলচর ও স্থলচর জন্তু আছে তেমনি জলচর ও স্থলচর গাছ আছে। ধানকে আমরা জলচর গাছ বলিলেও বলিতে পারি। মানুষ যদি সাঁতার না জানে তবে জলে পড়িলে বায়ুর অভাবে নাকানি চুবানী খাইয়া শীঘ্রই ডুবিয়া মরে, কিন্তু মাছেরা সচ্ছন্দে জলেই বিহার করে ও তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য যে বায়ু প্রয়োজন তাহা জল হইতেই গ্রহণ করে। ধানই বাঙ্গালার প্রধান ফসল বলিয়া ধানের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য অধিক ; কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে যেরূপ অবস্থায় ধান্য জন্মে, মানুষের প্রয়োজনীয় প্রায় অন্য কোন গাছই সেরূপ অবস্থায় বাঁচে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মাটীর অতিরিক্ত জল দূর করিয়া তন্মধ্যে বায়ুর চলাচলের সুবিধা হইবে বলিয়া অনেক জমি রীতিমত ড্রেন করা হয়। প্রায় দুই হাত নীচে সারি সারি খাপরার ড্রেন বসান হইয়া থাকে। কখন কখন জমির উপরিভাগেই ঢালুদিকে জুলী কাটিয়া (open drain) মাটীতে অতিরিক্ত জল বসা নিবারণ করা হয়। ইহাতে জমীর উর্ব্বরতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ধানের জন্য ইহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বর্ষাকাল শেষ হইলেই তরীতরকারীর ক্ষেত ও ফল ফুলের বাগানের মাটী কোদালী বা লাঙ্গল দিয়া পুনঃ পুনঃ গুঁড়াইয়া ধূলার মত করা উচিত। কেবল ক্ষেত বা বাগানের আগাছা মারাই ইহার লক্ষ্য নহে। আগাছা না থাকিলেও জমি মাসে অন্ততঃ দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয়।

ইহাতে গাছপালা যেমন সতেজ ও শ্রীসম্পন্ন হয়, আর কিছুতেই তেমন হয় না। তাহার একটী কারণ এই যে ইহাতে মাটীর মধ্যে বায়ুর চলাচল সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মাটীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে অনেক নীচে হইতে রস বা জল উর্দ্ধে উঠিয়া আসে ও উপরিস্থ বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। যদি উপরের ।৪ ইঞ্চি পরিমাণ মাটী লাঙ্গল বা কোদালী প্রভৃতির দ্বারা গুঁড়া করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র-ভাঙ্গিয়া যায়; তাহার ফলে নীচেকার জল এই গুঁড়ান মাটী ভেদ করিয়া তত পলাইতে পারে না এবং জমীর রস না শুকাইয়া জমীতেই থাকে। সেই রস উঠিয়া আসিয়া বৃক্ষাদিকে সতেজ করে। অর্থাৎ এইরূপে ক্ষেত ও বাগানের মাটী পুনঃপুনঃ নাড়িয়া দিলে প্রকৃতই ঐ জমীতে কতকটা জল সেচনের কাজ হয়।

কোন স্থানে যে বৃষ্টি হয়, তার কতকটা জমীতে বসিয়া যায় অর্থাৎ মাটীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, কতকটা মাটীর উপরিভাগ দিয়া গড়াইয়া খাল ও নালা দিয়া গিয়া নদীতে পড়ে; ও কতকটা উপরিভাগ হইতেই শুকাইয়া যায়। কলিকাতায় বৎসরে গড়ে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাহা যদি সমস্ত এক করা যায়, তবে প্রায় এক মানুষ সমান গভীর জলরাশি উৎপন্ন হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয় না। চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি হিমালয়ের পাদমূলে যেসকল স্থান আছে সেখানে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ অনেক অধিক। মধ্যভারতবর্ষে বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক বৃষ্টিও হয় না। আবার রাজপুতানা ও সিন্ধু দেশে বৎসরে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাহাতে মানুষের পায়ের পাতাও ডুবে না।

যে সকল স্থানে বৎসরে অন্ততঃ ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টি না হয় সেখানে ধান হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজেই ধান হয়; অন্যত্র বৃষ্টিও কম, ধানও বড় নাই। পশ্চিম ভারতের প্রধান ফসল জুয়ার ও বাজরা বঙ্গদেশের অনেকেই তাহা চক্ষেও দেখেন নাই। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ যেমন অল্প বৃষ্টির দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের (United States) পশ্চিমাংশও সেইরূপ অল্প বৃষ্টির দেশ। তাঁহারা পৃথিবীর নানাদেশে অনুসন্ধান করিয়া করিয়া এমন সকল ফসল লইয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য বেশী বৃষ্টির প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেবল সময়মত উপরের মাটী গুঁড়াইয়া ক্ষেতে রস রক্ষা করাই তাঁহাদের উন্নতির প্রধান সঙ্কেত। এইরূপ চাষের নাম Dry Farming. জমীর উপর উপর অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিয়া রস রক্ষা করা নূতন কথা নহে; আমাদের চাষারাও জানে। কিন্তু ইহার নূতন ব্যবহারে পশ্চিম আমেরিকার মরুভূমি রমণীয় উদ্যানে পরিণত হইতেছে। যে কালি-ফর্ণিয়া প্রদেশ ফলের জন্য এত বিখ্যাত, তাহা যুক্তরাজ্যের এই শুষ্কাংশে অবস্থিত।

আমাদের এই বঙ্গদেশে বৃষ্টি খুব প্রচুর বটে, কিন্তু আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল; পরে আর বড় বৃষ্টি হয় না। অনেকে মনে করেন যে রবিশস্য শিশিরের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নীচেকার মাটী হইতে রস উঠিয়াই তাহাদিগকে জীবিত রাখে। এই রসের উপরেই বড় বড় গাছের জীবনও নির্ভর করে। বর্ষার শেষেই যদি ফল ফুলের বাগান ও তরীতরকারীর ক্ষেতের মাটী গুঁড়াইয়া দিয়া জমীতে রস রক্ষা করা যায় তবে যে তাহাদের কত উপকার হয় বলা যায় না। কিন্তু যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাসে মাসে দু-একবার করিয়া এই মাটী নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে ভাল হয়। তবে বর্ষাকালে যখন মাটীর উপরিভাগ খুব ভিজা থাকে, তখন এরূপ করিলে গাছের অপকার হইবে।

কা'লে পাওয়া।

কা'লে পাওয়া কি জান? যদি না জান, তবে মন দিয়া আমার জীবনের ইতিহাস শ্রবণ কর। তখন বুঝিবে, কা'লে পাওয়া কি ভয়ঙ্কর। আমি অনেক দিন হইতে আমার জীবনের কথা লিখিয়া রাখিব মনে করিয়া

আসিতেছি, কিন্তু আজ নয় কাল আরম্ভ করিব, এই করিয়া কত বৎসর কাটিয়া গেল লেখা আর হইল না। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, লিখিবার শক্তিরও হ্রাস হইয়াছে। আর অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিতে পাইব না। তাই আজই আমার জীবন কথা আরম্ভ করিলাম। ইহা শুনিয়া তোমরা সাবধান হইতে পারিবে, এবং যাহাতে তোমাদিগকেও কা'লে না পায়, সেই চেষ্টা করিবে।

আমার পিতা একজন পণ্ডিত লোক,ছিলেন। যে সময়ে আমি ভূমিষ্ঠ হই, ঠিক সেই সময়ে তিনি বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত নিউটনের জীবন-চরিত পাঠ করিতেছিলেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছি শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "আমার পুত্র নিউটনের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত হইবে।" আমার অন্নপ্রাশনের সময় আমার কি নাম রাখা হইবে এই লইয়া খুব একটা আন্দোলন হইয়াছিল। আমার পিতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিউটন নামই রাখেন, কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলের সাহেবি নাম ভাল শুনায় না, সকলে সে বিষয়ে প্রতিবাদ করায়, অগত্যা আমার নাম রাখা হইল নীলরতন। নীলরতন আর নিউটন দুইটি নামেরই উচ্চারণ অনেকটা একরকম, এইজন্য পিতা এই নামই রাখিলেন।

যখন আমার জ্ঞান হইল, আমার পিতা তখন আমাকে প্রায়ই বলিতেন, "দেখ, নীলরতন তুমি কালে একজন বড় পণ্ডিত হইবে; এ কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিও।" ছেলেবেলায় আমার বুদ্ধি বেশ প্রখর ছিল, একবার যাহা শুনিতাম তাহাই মনে রাখিতে পারিতাম, একবারের অধিক দুইবার আমাকে কোন পড়া বলিয়া দিতে হইত না। এইজন্য শিক্ষক মহাশয়েরা আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন, বলিতেন "নীলরতন কালে নিউটন হইতে পারিবে।" আমিও আপনাকে বড় মনে করিতাম, মনে গর্ব্বও হইত।

কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকিলে কি হয়, আমার এক মস্ত দোষ ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার পুরা পাঠ অভ্যস্ত হইয়া যাইত বলিয়া আমি পরিশ্রম করিতে চাহিতাম না। সমস্ত সকাল বেলা আলস্যে কাটাইয়া স্কুলে যাইবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে একবার বইগুলি খুলিয়া পড়িয়া লইতাম। তাহাতেই আমাদের শ্রেণীতে সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যহ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতাম। আমার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে শিবচন্দ্র নামে একজন বালক ছিল। সেও ভাল ছেলে, কিন্তু সে অনেকক্ষণ পড়িয়া তবে তাহার পাঠ অভ্যাস করিতে পারিত। আমি ভাবিতাম, শিবুর প্রতিভা নাই, আমার প্রতিভা আছে। আমি এক ঘণ্টায় যে কাজ করিব, শিবু এক দিনে তাহা করিবে না। আমি পরে হাইকোর্টের জজ হইব, আর শিবুর যদি খুব উন্নতি হয় ত সে না হয় কোন স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইবে। কোথা হাইকোর্টের জজ আর কোথা স্কুল মাষ্টার! শিবুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমার হাসি পাইত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার আলস্যের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিল। যে কাজ আজ এখনই করা উচিত, তাহা আমি "কাল করিব" বলিয়া ফেলিয়া রাখিতাম। এইরূপে দিন দিন কাজ জমিয়া যাইত, শেষে এত কাজ কিরূপে শেষ করিব ভাবিয়া আকুল হইতাম। যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন গ্রীষ্মাবকাশের অল্প দিন পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আমাদের স্কুল দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "গ্রীষ্মাবকাশের পর এই শ্রেণীর যে ছাত্র ইংরাজীতে পরিশ্রমের উপকারিতা, সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি একটি রৌপ্য পাদক পুরস্কার দিব।" ছুটির দিন প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "নীলরতন, তুমি যদি 'কাল করিব' বলিয়া ফেলিয়া না রাখিয়া যত্নের সহিত প্রবন্ধটী লিখিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার প্রবন্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কারণ ক্লাসের সকল বালকের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ইংরাজী জান।" আমার মন আত্মগরিমায় ভরিয়া গেল। আমি স্থির করিলাম, বাটীতে আসিয়াই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিব।

কিন্তু বাটীতে আসিয়াই ভাবিলাম, "দেড় মাসের ছুটি তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? কাল আরম্ভ করা যাইবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে কয়েক জন সঙ্গী আসিয়া জুটিল। তাহাদের সহিত গল্পেই সময় কাটিয়া গেল। দুপুর বেলা বড় রৌদ্র—বড় গরম—সে সময় কি লেখাপড়া ভাল লাগে? সন্ধ্যার সময় আরম্ভ করা যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ঠাকুর মা আমার ভাই-ভগিনীগুলিকে লইয়া এমন সুন্দর আষাঢে গল্প আরম্ভ করিতেন যে তাহা না শুনিয়া থাকা যায় না। এইরূপে গল্প গুজব করিয়া, বাগানে আম পাড়িয়া, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বেড়াইয়া, বেশ সুখেই দিন কাটিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন মা বলিলেন "নীলু, তোদের স্কুল খুলিতে আর চারিদিন মাত্র বাকি আছে, এই ছুটিতে একবার তোর মাসীমার সঙ্গে দেখা করিয়া আয়।" সে কি!—মাত্র চারিদিন বাকি।—এই ত সেদিন ছুটি হইল! প্রবন্ধের যে এক লাইনও এখন লেখা হয় নাই। মাসীমার বাড়ী যাওয়া হইল না। প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম। কি কি কথা লিখিব, কি রকম করিয়া লিখিব, এই ভাবিতেই দুই দিন কাটিয়া গেল। তারপর লিখিতে আরম্ভ করিয়া, যে দিন স্কুল খুলিবে সেই দিন সকালে কোনরূপে প্রবন্ধটি শেষ করিয়া লইয়া গিয়া হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের হাতে দিলাম। প্রবন্ধ আমার মনের মত হয় নাই। কিন্তু ভাবিলাম, "আমার প্রতিভা আছে; সুতরাং লেখা আমার মনের মত না হইলেও, শিবচন্দ্রের প্রবন্ধের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। ওটা গাধা—প্রতিভা নাই, কেবল খাটে।"

কিন্তু শিবচন্দ্রের পরিশ্রমের কাছে আমার প্রতিভা পরাজিত হইল। যথাসময়ে ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, শিবচন্দ্রের প্রবন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণের সময় উহাকে রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে। আর আমার প্রবন্ধ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, "যদিও আমি পুরস্কার না পাইলাম, তথাপি আমার যে প্রতিভা আছে, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। যেহেতু উহারা দেড় মাস কাল পরিশ্রম করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, আর আমি চারিদিন মাত্র পরিশ্রম করিয়া তৃতীয় হইয়াছি।"

আমার পিতা এই সংবাদ পাইয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে এইরূপে পরিশ্রমে বিমুখ হইলে, তাঁহার পুত্র যেমন প্রতিভাশালীই হউক না কেন, তাহার উন্নতির কোন আশা নাই। তাই কালে আমার এই স্বভাব সংশোধনের এক উপায় বাহির করিলেন। নানা পুস্তক অন্বেষণ করিয়া করিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা তিনি আমাকে দিয়া বলিলেন, "এইগুলি প্রত্যহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। তাহাতেই তোমার স্বভাব সংশোধিত হইবে।" কবিতাগুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে:—

"দিবানিশি আলস্যে যে সময় কাটায়।
তাহার সমান মূর্খ নাহিক ধরায়॥"

"এমন আশ্চর্য্য আর কি আছে সংসারে।
সময়ে তাড়ায়ে দিয়া পুনঃ চাহি তারে॥"

"আত্মহত্যা মহাপাপ সর্ব্বজনে কয়।
সেই পাপে পাপী, বৃথা হরে যে সময়॥"

"অলক্ষ্যে পশিয়া ঘরে, চোর আসি চুরি করে,
যবে ধরা পড়ে তবে মহাদণ্ড পায়।
কিন্তু নিত্য কাল-চোর, চুরি করে আয়ু মোর,
এই ভেবে কয় জন ধরে গিয়া তায়॥"

"কত যত্নে রতন ল'য়ে, পাছে কেহ চায়,
এই ভেবে লুকাইয়া রাখিছ তাহায়।
শত রত্নাধিক আয়ু কিন্তু সর্ব্বক্ষণ,
হেলায় হারাও, এ কি বিজ্ঞের লক্ষণ?"

"নদী-স্রোত যায় বটে, কিন্তু আসে ফিরে,
বারেক সময় গেলে আর নাহি ফিরে!"

কবিতাগুলি মুখস্থ করিলাম, ফল একই হইল, আমার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। আমার দোষ আমি বিলক্ষণই বুঝিতাম, সে জন্য কবিতা মুখস্থ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে সে দোষ সংশোধন করিতে হইলে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন, তাহারই আমার অভাব ছিল। কবিতা মুখস্থ করিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আসে না। কাজেই আমারও দোষের সংশোধন হইল না।

বরং যত দিন যাইতে লাগিল, ততই উহা বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। আমি স্থির করিলাম পরীক্ষার ঠিক একমাস পূর্ব্ব হইতে প্রাণপণে খাটিব। তাহা হইলে সমস্ত বিষয় আয়ত্ত হইবে। যাহার প্রতিভা আছে, একমাস পরিশ্রম তাহার পক্ষে যথেষ্ট। পিতা বলিতে লাগিলেন, "নীলরতন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিতে হইবে, নচেৎ আমার মুখ থাকিবে না। আমার এখনও বিশ্বাস তুমি একজন মস্ত লোক হইবে।" পিতার কথায় হৃদয় উত্তেজিত হইল, স্থির করিলাম, "কা'ল হইতে পড়িতে আরম্ভ করিব।" কিন্তু যাহাকে কা'লে পায়, সে চিরকালই কা'লের ক্রীতদাস হইয়া থাকে।

পরীক্ষার আর একমাস মাত্র সময় আছে, এমন সময়ে পিতাঠাকুর মহাশয়ের এক কঠিন পীড়া হইল। তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য আমাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। পড়াশুনায় মন দিতে পারিলাম না। তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবিলাম, "হায়, যদি কা'ল করিব বলিয়া না রাখিয়া দিতাম, তাহা হইলে পরীক্ষার জন্য আজ আমাকে এরূপ হতাশ হইতে হইত না।"

পরীক্ষার দিন উপস্থিত। পরীক্ষা দিতে গেলাম। কোন পুস্তকই ভাল করিয়া দেখা হয় নাই ; সুতরাং ভাল লিখিতে পারিলাম না। পরিশেষে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন পরীক্ষা দেওয়া হইল ?" আমি কি বলিব, স্থির করিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে কখনও পিতার নিকট মিথ্যা কথা বলি নাই। কিন্তু আজ, পাছে তাঁহার এই রুগ্ন অবস্থায় মনে কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া বলিলাম, "মন্দ হয় নাই।" হায়, আজ আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইল ! কেন ? কেবল আমাকে কা'লে পাইয়াছিল বলিয়া।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। শিবচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, আর আমি কোনরূপে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। সমস্ত আশা নষ্ট হওয়ায়, পিতার হৃদয় ভগ্ন হইল। তিনি আর সে রোগ হইতে সারিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অল্পদিন পরেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুশয্যায়ও তিনি আমাকে বলিলেন, "নীলরতন, আমার এখনও বিশ্বাস, তুমি একজন বড়লোক হইবে। কিন্তু সাবধান আর যেন তোমাকে কা'লে না পায়।" আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিলাম। এই অল্প বয়সে সংসারের ভার ঘাড়ে পড়িল। আর পড়াশুনা করা চলিবে না। চাকরির চেষ্টা করিতে হইবে। এতদিন যে আশায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা জলাঞ্জলি দিতে হইল। এই চিন্তায় আমার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। আমি এই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেই বিদ্যা হয় না। বায়রন, শেলি, স্কট, টেনিসন প্রভৃতি ইংরাজ মনীষিগণের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহাদের নাম সুবর্ণাক্ষরে লিখিত। আমাকে বাধ্য হইয়া চাকরি করিতে হইবে বটে, কিন্তু বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ লেখাপড়া করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে এমন একখানি গ্রন্থ লিখিব, যদ্দ্বারা আমার যশ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে। তখন শিবচন্দ্র বুঝিবে, প্রতিভা বড় কি পরিশ্রম বড়। আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষোভের কারণ—শিবচন্দ্রের কৃতকার্য্যতা। সে প্রতিভাহীন সাধারণ বুদ্ধি ছাত্র হইয়া আমার উপরে গেল ! তা যা'ক, আমি হাইকোর্টের জজ হইতে পারিব না বটে, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় হইব—বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকার। আর শিবচন্দ্রের অদৃষ্টে স্কুলমাষ্টারি ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা যেন আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

যখন হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সার্টিফিকেট আনিতে গেলাম, তিনি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উপস্থিত ছাত্রগণকে বলিলেন—"Here is a boy who has a giant's ambition, but a dwarf's power of work" (এই বালকের আশা অতি উচ্চ, কিন্তু ইহার কাজ করিবার ক্ষমতা অতি অল্প), পরে আমার দিকে

ফিরিয়া বলিলেন, "Young man, you have made yourself a slave of to-morrow; if you do not resolutely free yourself from that bondage, you must die a nameless, miserable man." (তুমি কা'লের ক্রীতদাস হইয়াছে; যদি দৃঢ়তার সহিত সেই দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত না কর, তবে নানা কষ্ট পাইয়া মরিবে, কেহ তোমার নামও জানিবে না)।

ঘৃণায়, লজ্জায় ও দুঃখে আমি মরিয়া গেলাম। মাথা হেট করিয়া সার্টিফিকেট খানি লইয়া বাড়ী আসিলাম। আমার চোখে জল পড়িতেছিল। আমি স্থির করিলাম, "কা'ল হইতে আমার জীবন সম্পূর্ণ নূতন হইবে! Nameless ও miserable হইয়া মরা হইবে না। এমন জিনিস রাখিয়া যাইব যাহা—

অমর করিবে মোরে এ মর সংসারে।
পূজিবে জগৎ রাখি' হৃদয়-মাঝারে॥

এবার কেমন নূতন জীবন লাভ হইল, তাহা পরসংখ্যায় জানিতে পারিবে।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ।

পিসিমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাবার সঙ্গে পুরোহিত মহাশয়ের যে সকল কথা হইল, তাহা শুনিয়া আমার মনে দুঃখও হইল ভয়ও হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম মা ত আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন, তাহার পর বাবা যদি পুনরায় বিবাহ করেন, তাহা হইলে আমরা কাহার কাছে দাঁড়াইব? আমার বয়স যদিও অধিক হয় নাই, আমি যদিও বেশী দেখি নাই বা অনেক পড়াশুনা করি নাই, তবুও কি জানি কেন বিমাতার নাম শুনিয়াই আমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল! শুনিয়াছি বিমাতা নাকি কোন দিন আপনার হয় না; বাবা যদি বিবাহই করেন, তাহা হইলে আমরা কাহার কাছে দাঁড়াইব, কিন্তু তখনই মনে হইল, কেন ভয় কি, আমাদের পিসিমাই আছেন!

এই কথা মনে হইবামাত্রই আমি আর বাগানের মধ্যে বেড়াইতে পারিলাম না। তখনই পিসিমার কাছে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। পিসিমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার ইচ্ছা হইল। আমি ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দেখিয়াই, আমার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়াই পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা! তোমার মুখ অত মলিন হয়েছে কেন? ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? আমি আবাগী, তোমার মুখের দিকেও চাইবার সময় পাই নাই। এস দুটো খেতে দিই।"

আমি বলিলাম, "কই পিসিমা, আমার ত ক্ষিদে পায় নি। ক্ষিদে পেলে তোমার কাছে চেয়েই খাব।" আমার কথায় বাধা দিয়া পিসিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোরা আবার তেম্নি!" আমি বলিলাম, "না পিসিমা, এখন তোমার কাছে না চাইলে কোথায় যাব? দেখ পিসিমা, আজ এই একটু আগে পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে বাবার কি কথা হচ্ছিল, তা তুমি শুনেছ?" পিসিমা বলিলেন, "কই, না। পুরুতঠাকুর এসেছিলেন, তাই দেখেছি। তাঁর সঙ্গে কি কথা হ'ল তাত জানিনে। কেন? কি হয়েচে?" আমি বলিলাম, "পুরুতঠাকুর বাবাকে আবার বিয়ে কর্ত্তে বলছিলেন।" "এঁ্যা, বিয়ে করতে বলছিলেন? দুদিনও সবুর সইলো না! এরা মানুষ না কি! এদের কি দয়ামায়া বলে কিছুই একটা নেই! এখনও যে চিতার আগুন নেবেনি—এরই মধ্যে বিয়ের কথা! যাক্—সে কথা শুনে তোমার বাবা কি বল্লেন?" আমি বলিলাম, "বাবা কি বললেন, ঠিক

---

* Miss Edgeworthএর "Tomorrow" নামক গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

সে কথাগুলো বল্‌তে পারব না, তবে তার ভাবটা এই যে, তিনি বল্‌লেন, 'এখনই সে কথা কেন? ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে।" পিসিমা আমাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তাতে তোদের ভয় কি? তোর বাবার ইচ্ছে হয় একটা কেন, দশটা বিয়ে করুক। তোরা আমার কাছেই থাক্‌বি। আমি যে কদিন বেঁচে আছি সে কয়দিন তোদের কোন ভাবনা নেই? তোর বাপ যদি বিয়েহ করে, সে তার বৌ নিয়ে কল্‌কাতায় থাক্‌বে, তোরা আজও আমার কালও আমার।"

আমি বলিলাম, "তুমি বাবাকে একথাটা জিজ্ঞাসা করবে না?"

পিসিমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করার কথা বলছ? না—আমি আপনা হতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। দেখি সে কিছু বলে কি না!"—এই বলিয়াই পিসিমা সেখান হইতে উঠিয়াই কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। পিসিমার কথা শুনিয়া, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে আরও ভয় হইল। কে যেন, আমাকে বলিতে লাগিল, "আমার বাবা নিশ্চয়ই বিয়ে কর্ব্বেন! তখন মায়ের মুখ মনে পড়িয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না—পাছে কেহ আমাকে কান্দিতে দেখে সেই ভয়ে, কোঁচার কাপড় দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া ফেলিলাম। তাহার পরই ঘরের মধ্যে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। শুইলাম বটে! কিন্তু ঘুম আসিল না। যতই মনে করিতে লাগিলাম ও সব কথা আর ভাবিব না, ততই ঐ ভাবনাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মনে উঠিতে লাগিল।

এমন সময়ে বাবা কোথা হইতে আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইলেন এবং দিদি দিদি বলিয়া পিসিমাকে ডাকিতে লাগিলেন। বাবার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই পিসিমা সেখানে আসিলেন। বাবা তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দিদি এক মজার কথা শুনেছ?"

পিসিমা বলিলেন, "মজার কথা আবার কোথায় পেলি? তোর ছেলেমানুষী এখনও গেল না!" বাবা বলিলেন, "না দিদি ভারি মজার কথা! অন্যে সে কথা শুনলে হয়ত দুঃখিত হ'ত. আমি কিন্তু কিছুতেই হাসি চেপে রাখ্‌তে পারছিলুম না।"

পিসিমা বলিলেন. "এমন হাসির কথাটা কি শুনিই না।"

বাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে সেই কথা বলবার জন্যেই ত তোমার কাছে ছুটে এসেছি। দেখ, পুরুতঠাকুর বল্‌ছিলেন কি না, যে আমাকে বিয়ে করতে হবে। হাসির কথা নয় দিদি? আচ্ছা বল দেখি, এই পণ্ডিত বামুনগুলো আমাদের মানুষ মনে করে না জানোয়ার মনে করে?"

বাবার কথায় বাধা দিয়া পিসিমা বলিলেন, "ছি, পরেশ, অমন করে কি কথা বল্‌তে আছে! হাজারও হোক, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তার সম্বন্ধে কি তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য কর্ত্তে আছে।"

বাবা বলিলেন, "এমন কথা শুন্‌লে কি মনে হয়, তুমিই বল না? তোমার কাছে যদি পুরুত মশাই এই কথা বল্‌তেন, তা হলে তুমি কি মনে করতে। তুমি যা মনে করতে অথচ মুখ ফুটে বল্‌তে না, আমি তাই ব'লে ফেললাম। কেমন?"

পিসিমা বলিলেন "মনে যা হয় তা কি সব সময় মুখ ফুটে বল্‌তে আছে। তুই এত বড় হলি; শুনি নাকি তুই ভারি মস্ত উকিল, তোর এখনও কাণ্ডজ্ঞান হোল না। পুরুতমশাই গুরুজন, সেকেলে মানুষ। তিনি সেকেলে মতই বোঝেন, সেকেলে ধরণেই ভাবেন। তাই তিনি কথাটা ব'লে ফেলেছেন। তা তুই তাঁকে কি বল্‌লি।—তাঁকে ত কোন অন্যায় কথা বলিস্ নি, বা তাঁর সম্মুখে ঠাট্টা তামাসা করিস্ নি?"

বাবা বলিলেন "তুমি কি আমাকে এমনই ছেলেমানুষ মনে কর। আমি তেমন কথা কিছুই বলি নি; আমি অনেক চেষ্টায় যে হাসি থামিয়ে রেখেছিলাম, সেই আমার বাহাদুরী।"

পিসিমা বলিলেন "বেশ করেছিস্। তাঁর কথা শুনে

যদি হেসে ফেল্‌তিস, তা'হলে তিনি মনে বড় কষ্ট পেতেন। যাক্‌, তিনি এবার এলে আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

বাবা বলিলেন "তাঁকে কি বল্‌বে? বল্‌বে যে ডাগর দেখে একটা মেয়ে দেখ, আমি ভাইয়ের বিয়ে দেব। কেমন?"

পিসিমা বলিলেন "সে কথা যদি কখন বল্‌বার সময় হয়, তখন আমি আর বল্‌ব না; সে কথা বল্‌বার ভার তোর উপরেই দেব। এখন তিনি এলে বল্‌ব যে, ভাইয়ের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তা আমিই স্থির কর্‌ব।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন "আর আমি যদি তোমার কথা না শুনি, তা হলে কি হবে?"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন "তার অনেক দেরী আছে। তুই এ জন্মেও সাবালক হচ্চিস নে, তা এম, এ পাশই করিস, আর হাইকোর্টের উকিলই থাকিস্‌। বুদ্ধিশুদ্ধি এখনও কিছুদিন দিদির কাছেই ধার করতে হবে। এখন যা, অন্য কাজ দেখ্‌গে। ভাল কথা, তোর সঙ্গে যখন পুরুত ঠাকুরের কথা হচ্ছিল, তখন তোর ছেলে বাহিরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছিল। তারপরে বাছা আমার মুখখানি ভার ক'রে এসে আমাকে সব কথা বল্‌ল। তার কথা শুনে আমার বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল। আহা, ছেলেমানুষ, মায়ের মুখ এখনও ভুল্‌তে পারে নি। এমন যে হবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। সতীলক্ষ্মী সকল বোঝা আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে সিঁথেয় সিঁদুর পরে স্বর্গে চলে গেল, আর আমি এখন তোদের নিয়ে সাগরে ভাসি।"

বাবা বলিলেন "এই দেখ, তোমার কাছে আমি মজার কথা বল্‌তে এলাম্‌, আর তুমি কি না কি সব আরম্ভ করে দিলে।"

পিসিমা বলিলেন "দেখ, তুই আমাকে কি ভুলাতে পারবি। আমি তোকে, বল্‌তে গেলে, এক রকম কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। তোর মুখের দিকে চাইলে আমি তোর মনের কথা বুঝতে পারি। তুই যে আমাকে ভুলাবার জন্যে হাসিস, তা কি আর আমি বুঝতে পারি না। তোর প্রাণের মধ্যে যে কেমন করে, তা কি আর আমি জান্‌তে পার্‌ছি না। তা না হ'লে সব কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়ে তোকে কি বাড়ী নিয়ে আস্‌তাম।"

পিসিমার কথা শুনিয়া বাবা নীরব হইলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য বাবা হাসি দিয়া সব ঢাকিয়া রাখিতে চান। বাবার কথা শুনিয়া আমার দুর্ভাবনা দূর হইল; বাবা যে পুনরায় বিবাহ করিবেন না, তিনি যে আমাদেরই বাবা থাকিবেন, তাহা তাহার কথা শুনিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম।

এই ভাবে আরও দশ বার দিন কাটিয়া গেল। একদিন বাবা পিসিমাকে বলিলেন "দিদি, এমন করিয়া আর ত বাড়ী বসিয়া থাকতে পারি না। ওদিকে কাজ কর্ম্মেরও ক্ষতি হচ্চে। তুমি যদি বল তা হলে আমি কলিকাতায় যাই। কাজকর্ম্ম ত কর্‌তেই হবে, ছেলেপিলেদের ত মানুষ কর্‌তে হবে।"

পিসিমা বলিলেন "সে কি আর আমি বুঝতে পারছি নে। কিন্তু কি যে করা যায়, তা আমি ভেবে স্থির কর্‌তে পারছি নে। ছেলেপিলেদের বাসায় নিয়ে যাওয়া ত অসম্ভব। তুই কি আর ওদের দেখ্‌তে পার্‌বি। ওরা এখানেই থাক। এখানেই ওদের পড়াশুনার বন্দোবস্ত করে দিই। আমি ওদের চক্ষের আড়াল কর্‌তে পারব না। কিন্তু ওদের কথা ত আমার ভাবনার বিষয় নয়। আমি ভাব্‌ছি তোর কথা। তুই একেলা কলিকাতায় থাকবি কি ক'রে; তোকে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে! তোকে একেলা কলিকাতায় রেখে—আমি যে একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার্‌ব না। এদিকে বাড়ী ঘরদুয়োর ছেড়ে দিয়ে সব নিয়ে কলিকাতায় গেলেও চলে না। এই ভাবনাই ত আমার প্রধান হয়েছে।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন "দিদি, তুমি আমাকে যত ছেলেমানুষ মনে কর, আমি তা নই। আর জান কি,

অবস্থাতেই মানুষ তৈরি হয়। এতদিন তোমরাই সব দেখ্‌তে, আমার কিছুই দেখ্‌তে হ'ত না, আমি কাজকর্ম্ম করেই খালাস থাকৃতাম। এখন যখন সব গোল হয়ে গেল, তখন আমি ঠিক সব গুছিয়ে নিতে পার্‌ব। তার জন্য তুমি মোটেই ভেব না।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা পিসিমা, আমি কেন বাবার সঙ্গে কলিকাতায় যাই না। আমি ত বড় হয়েছি। আমি বাবার কাছে থাক্‌লে আর ওঁর কোন কষ্ট হবে না, আমি সব দেখ্‌ব শুন্‌ব।"

আমার কথা শুনিয়া পিসিমা বলিলেন "শোন ছেলের কথা। উনি সব দেখ্‌বেন শুন্‌বেন। ওঁকে কে দেখে তার ঠিক নেই। যেমন বাপ তেমনই ছেলে। তবে একটা কাজ কর্‌লে হয়। আমি বলি কি, রামচরণ দাদা তোর সঙ্গে কলিকাতায় যাক্‌, তা হ'লে আমি তোকে যেতে দিতে পারি। সে যদি তোর কাছে থাকে, তা হলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

বাবা বলিলেন "রামচরণ দাদা কলিকাতায় গেলে এখানকার উপায় কি হবে? তুমি একেলা কতদিক্‌ দেখ্‌বে।"

এই সময় রামচরণ জ্যেঠা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম "জ্যেঠা, পিসিমা বল্‌ছেন, তোমাকে বাবার সঙ্গে কলিকাতায় যেতে হবে, আর সেখানেই তোমাকে থাক্‌তে হবে।"

রামচরণ জ্যেঠা বলিল "সে কথা আমিও ভেবে রেখেছি। তোমার বাবাকে আমরা একেলা ছেড়ে দিতে পার্‌ব না। তবে এদিকের কথা। তা এক রকম ক'রে চলে যাবে। মাসের মধ্যে দুইবার যদি দুই এক দিনের জন্য আমরা এখানে আস্‌তে পারি, তা হলেই সব ঠিক করে রাখ্‌তে পারব।"

বাবা বলিলেন "তোমাদের যদি এই মতই হয়, তা হলে রামচরণ দাদাই আমার সঙ্গে যাবে। আমরা প্রতি শনিবারেই বাড়ী আস্‌ব।"

এই কথাই স্থির হইয়া গেল। পিসিমা আচার্য্য ঠাকুরকে ডেকে ভাল একটা দিন দেখালেন এবং সেই দিনে বাবা রামচরণ জ্যেঠাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বেই বাবা আমাকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতি।

এই পৃথিবীতে কত বিভিন্ন রকমের মানুষ আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় অন্ততঃ শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, হরিদ্রাভ চীনা বা বার্ম্মিজ দেখিয়াছ; কেহ কেহ আশা করি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিও দেখিয়াছ তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের লোক ত সকলেই দেখিয়াছ। একজন কাফ্রি, ইউরোপীয়, ভারতবাসী ও চীনাতে কত প্রভেদ! এই যে কয়জাতীয় মানুষের নাম করিলাম তদ্ভিন্ন আরও কত রকমের মানুষ আছে। আবার এই সকল শ্রেণীর মধ্যেও অনেক পার্থক্য। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী আছে। তোমাদের চক্ষুতে হয়ত সে পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু যাঁহারা ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে পরিচিত তাঁহারা দেখিলেই বলিয়া দিতে পারিবেন একজন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ কি ফরাসী, কি জর্ম্মান।

মানুষের গঠন, রং, চেহারা ইত্যাদিতে এসব পার্থক্য দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে সকল মানুষ বোধ হয় একজাতীয় জীব নহে। কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত। জল, হাওয়া এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে আকৃতি প্রকৃতি ও গায়ের রঙে অনেক পার্থক্য হইলেও সকল মানুষ মূলতঃ একই জাতীয়। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য দেখা যায় স্বাভাবিক কারণেই তাহা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য জীবের মধ্যেও এই প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন দেখ ঘোড়া; ইংলণ্ডের ঘোড়া, আমাদের দেশের ঘোড়া, আরব দেশের ঘোড়া, এবং অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়ায় কত প্রভেদ; কিন্তু তাহা হইলেও এগুলি সর্ব্ব ঘোড়া। আবার একদেশের জন্তুকে

বিভিন্ন জাতীয় মানুষের মস্তক।

(A) গরিলা, (B) অষ্ট্রেলিয়ান, (C) কাফ্রি, (D) আমেরিকান, (E) মঙ্গোল, (F) ইউরোপীয়ান।

অন্যদেশে লইয়া গেলে ভিন্ন জল-হাওয়া ও প্রাকৃতিক কারণে অল্পদিনের মধ্যে তাহার আকৃতিতে কত পরিবর্ত্তন হয়। ইউরোপের কোনও লোক যদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া বাস করে দুই তিন পুরুষের মধ্যে তাহার বংশে চেহারা ও রঙে কত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। যাহা হউক, কি প্রকারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে আকৃতি প্রকৃতি, গায়ের রঙ প্রভৃতিতে এত পার্থক্য আসিল সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়া আমরা তোমাদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় মানবের বিবরণ সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীর নানাস্থানে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে এক বা ততোধিক লক্ষণ অনুসারে কয়েকটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। স্থূলদৃষ্টিতে গায়ের রঙে এক পার্থক্যই প্রথমে লক্ষিত হয়। ইউরোপের অধিবাসীরা কেমন সাদা; আবার আফ্রিকার কাফ্রিরা কত কাল। যাহারা উপরে উপরে দেখে তাহারা এই রঙের পার্থক্য দেখিয়াই মানুষের শ্রেণী বিভাগ করে। আমাদের দেশের জাতিভেদ এই প্রকার রঙের পার্থক্য হইতেই হইয়াছিল। জাতির অন্য নাম বর্ণ, তাহা হইতেই প্রমাণ হয় যে প্রথমে বর্ণ অর্থাৎ গায়ের রঙ্ অনুসারে জাতিভেদ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গায়ের রঙ্ কোন মূলগত স্থায়ী পার্থক্য নহে, সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং রঙ্ অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে। কোন কোন পণ্ডিত মাথার খুলীর গঠন অনুসারে মানুষকে

কয়েকটী শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, যেমন ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, কাফ্রি, আমেরিকান্ ও অষ্ট্রেলিয়ান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে মস্তকের গঠনের বেশ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তদনুসারে শ্রেণী-বিভাগেরও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নাম। বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ মনে করেন যে তদপেক্ষা ভাষা অনুসারে জাতিবিভাগ সুবিধাজনক; কিন্তু তাহাতেও ভ্রমের সম্ভাবনা আছে, কেননা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে কোনও কোনও জাতি অন্য জাতির নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। যেমন ফরাসী দেশের অধিকাংশ লোক কেল্টিক (Celtic) জাতিসম্ভূত; কিন্তু তাহারা প্রাচীন রোমানদের নিকট হইতে লাটিন ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফল কথা এ পর্য্যন্ত জাতি বিভাগের কোনও সর্ব্ববাদীসম্মত মূলসূত্র পাওয়া যায় নাই। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে পৃথিবীর মানব সকলকে নিম্নলিখিত বারটী বিভাগে বিভক্ত করেন; যথা, (১) আমেরিকান, (২) সামুদ্রিক শ্রেণী, (৩) তুরেনীয়ান, (৪) পারশী শ্রেণী, (৫) হিন্দু শ্রেণী, (৬) আফ্রিকান, (৭) মঙ্গোলিয়ান, (৮) ককেশীয়ান, (৯) ইউরোপীয়। সংক্ষেপে এই সকল জাতির স্থূল বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল:

১। নাক।

২। ফুটবল।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীমতী স্নেহলতা মল্লিক, M. N. Abul Hasnat Esqr., শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীদীনবন্ধু নাথ, শ্রীমতী নীহার কুমারী দত্ত, শ্রীমতী পরিমলকুসুম দাসগুপ্ত, শ্রীমতী অমিয়াবালা দাসগুপ্ত, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীমোহন দত্ত।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীমতী সলিলা দাসী, শ্রীভবনীমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রমোদবিহারী রায়, A. Pradhan Esqr., শ্রীমতী রেণুকা মল্লিক, শ্রীবিজেতা চৌধুরী, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলাকান্ত সরকার, N Das Gupta. Esqr. ও শ্রীতুষাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা বসু, শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে প্রেরিত)

১। এমন একটি সংখ্যা মনে কর যাহাকে ৪ দিয়া গুণ, ভাগ, যোগ ও বিয়োগ করিয়া ফলগুলি একত্রে যোগ করিলে ১০০ হইবে।

২। এমন একটি মানবের শত্রু, ভয়ঙ্কর জীবের নাম কর যে তাহাকে দুই ভাগ করিয়া সেই অংশগুলি পুনরায় যোগ করিলে ১০০ হইবে; তোমরা যদি বুঝিতে না পার ইহাও বলিতেছি যে তাহার প্রথম ভাগের অর্থ মস্তক। বল ত কি?

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা। } মুকুল কার্য্যালয়, ২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট,—কলিকাতা { প্রতি সংখ্যা ডাকমাশুল
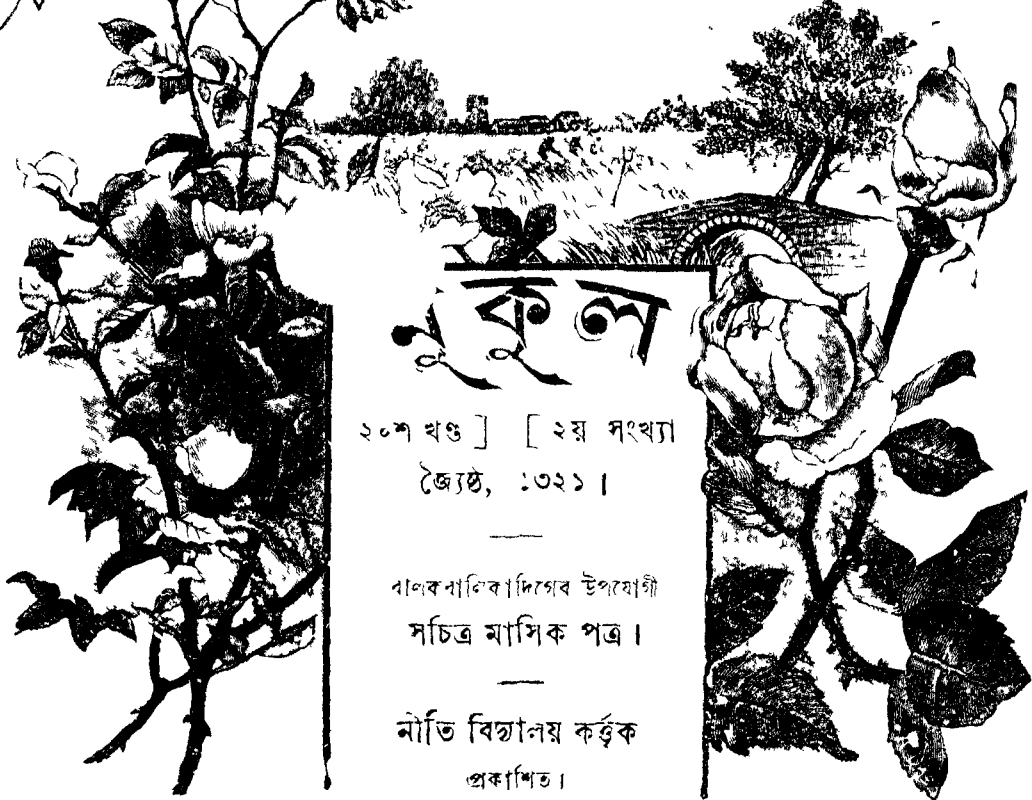
গ্রীনল্যাণ্ডের বাসিন্দা।

২০শ বর্ষ]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।　　[২য় ভাগ

প্রার্থনা।

দয়াময়! দয়া করে দাও অধিকার,—
তোমার করুণা বলে　　তোমারি প্রাসাদ তলে
চিরদিন কুতূহলে যেন অনিবার
মোর এ হৃদয়-বীণা　　সকল বাঁধন-হীনা
কেবলি বাজাতে পারি পাশরি সংসার।
দয়াময়! দয়া করে দাও অধিকার।

দয়াময়! দয়া করে দাও অধিকার,—
তোমার করুণাবলে　　তোমারি চরণতলে
পূজার নির্ম্মাল্য হেন জীবন আমার
রোগে শোকে সুখে দুখে　　যেন সদা হাসি-মুখে
নীরবে সঁপিতে পারি পুলকে অপার!
দয়াময়! দয়া করে দাও অধিকার!

দয়াময়! দয়া করে দাও অধিকার,—
হৃদয়-বীণার সুরে　　যেন এ মরতপুরে
ভেঙ্গে দেয় হর্ষ ভরে সুপ্তি সবাকার!
জীবন নির্ম্মাল্য মোর　　মুছে দেয় আঁখি-লোর
জানায়ে ব্যথিত জনে করুণা তোমার!
দয়াময়! দয়া করে দাও অধিকার!

পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রথমতঃ আমেরিকান জাতির কথা বলিব। আমেরিকান বলিতে আমেরিকার বর্ত্তমান সময়ের প্রধান অধিবাসীদের বুঝিতে হইবে না। আমেরিকার বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ অধিবাসী বিদেশী। কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক নূতন আবিষ্কৃত মহাদেশে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক ইউরোপ হইতে আমেরিকায় গিয়া বসতি করিতেছে। কিন্তু আমেরিকান বলিতে আমেরিকার আদিম অধিবাসী বুঝিতে হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতে আমেরিকায় মানুষের বসতি ছিল। যখন কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন সেখানে এই শ্রেণীর লোক অনেক ছিল। কিন্তু ইউরোপের প্রবল ঔপনিবেশিকদের সংস্পর্শে এই জাতীয় লোক ক্রমে লোপ পাইতেছে। তথাপি এখনও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানাস্থানে এই জাতীয় লোক আছে। এ প্রবন্ধে তাহাদেরই কথা বলিব।

নানাস্থানের আমেরিকানদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিলেও তাহারা মূলতঃ এক জাতীয় লোক। সাধারণতঃ তাহারা স্থূলকায়, সবল, সুশ্রী, এবং এস্কিমো জাতি ছাড়া আর সকলেই দীর্ঘাকৃতি। তাহাদের চক্ষু কটাভ, চুল সাদা এবং লম্বা ও গায়ের রঙ অল্পাধিক তাম্রবর্ণ। আমেরিকানেরা সাধারণতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী এবং সুদর্শন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সভ্যতার উন্নতি হয় নাই; মৃগয়া তাহাদের উপজীবিকা; অতি সামান্য স্থলেই তাহাদিগকে একস্থানে বসতি করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকানেরা চিরকালই আমেরিকার অধিবাসী কি অতি প্রাচীনকালে তাহারা অপর কোন স্থান হইতে আসিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু তাহাদের আকৃতি, আচার ব্যবহার এবং ভাষা দেখিয়া মনে হয় তাহারা কোনও সুদূর অতীত কালে এশিয়া মহাদেশ হইতে আসিয়াছিল। যে সকল আমেরিকানেরা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে বাস করে তাহাদের আকৃতিতে মঙ্গোলদের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য আছে। বেরিং প্রণালীর পার্শ্বস্থিত এশিয়াবাসী চুকচী ও আমেরিকার উপকূলবাসী এস্কিমোরা পরস্পরের কথাবার্ত্তা বেশ বুঝিতে পারে। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে উভয় তীরের লোকেরা তাহাদের ডোঙ্গা ও ছোট নৌকায় একপার হইতে অপর পারে যাতায়াত করে।

অনুমান করা হইয়াছে যে সম্ভবতঃ জাপান, কিউরাইলদ্বীপ ও তৎসমীপবর্ত্তী ভূভাগ আমেরিকানদের আদিম বাসস্থান ছিল। এই স্থান হইতে আমেরিকায় গমন করিয়া তাহারা ক্রমে আমেরিকার সমুদয় অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখন আমেরিকা মহাদেশে উত্তর মহাসমুদ্র হইতে কেপ হর্ণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আমেরিকানদের দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে তাহাদের পরস্পরের আচার ব্যবহার এবং ভাষাগত অনেক পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তথাপি মূলতঃ যে তাহারা একজাতি সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

মুকুলের পাঠকপাঠিকারা এস্কিমোদের সঙ্গে সুপরিচিত। উত্তরমেরু আবিষ্কারবিষয়ক প্রবন্ধ সকলে মুকুলে এস্কিমোদের বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে। এই এস্কিমোরা আমেরিকান জাতির অন্তর্ভুক্ত। এস্কিমোরা বেরিং প্রণালী হইতে গ্রীণলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে বাস করে; কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ভাষা ও আচার ব্যবহারে বেশ একতা দৃষ্ট হয়। এস্কিমোদের দেশ বরফে আচ্ছন্ন; চারিদিকে বরফ, উপর হইতেও বরফ পড়িতেছে, ইহার মধ্যে কি করিয়া মানুষ বাস করিতে পারে তাহা ধারণাও হয় না। কিন্তু এই বরফের রাজ্যে এস্কিমোরা কুকুরটানা গাড়ীতে বা চামড়ার নৌকায় আনন্দে বিচরণ করে। এস্কিমোরা অন্যান্য আমেরিকান-দের তুলনায় খর্ব্বাকৃতি; তাহারা সচরাচর লম্বায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি; কিন্তু তাহাদের পোষাকের জন্য তাহাদিগকে আরও খর্ব্বাকৃতি দেখায়।

এস্কিমোদের মুখ খুব মোটা এবং গোলাকার, নাক কিছু চাপা। অন্যান্য আমেরিকানদের অপেক্ষা তাহাদের গায়ের রঙ সাদা, কিন্তু সচরাচর তাহারা এত অপরিষ্কার এবং ধুঁয়াতে এত আবৃত থাকে যে তাহাদের স্বাভাবিক রঙ কমই দেখিতে পাওয়া যায় এস্কিমোদের মাথার চুল লম্বা এবং কাল, তাহাদের প্রায়ই দাড়ি গোঁপ দেখিতে পাওয়া যায় না। হাত পা অপেক্ষাকৃত ছোট, এবং স্কন্ধদেশ বিস্তৃত। ইউরোপের লোকদের অপেক্ষা তাহারা হীনবল। ইউরোপ হইতে আগত জাহাজের খালাসীদের কাজ দেখিয়া এস্কিমোরা তাহাদিগকে অসাধারণ শক্তিশালী লোক মনে করে। অল্পবয়সে এস্কিমোদের দাঁত বেশ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল থাকে, কিন্তু বালিমিশ্রিত এবং অসিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এবং দাঁত পরিষ্কার না করার জন্য শীঘ্রই তাহাদের দাঁত খারাপ হইয়া যায়। এস্কিমোরা বড় অপরিষ্কার। তাহারা জলের সঙ্গে সম্পর্ক বড় রাখে না; সেই প্রচণ্ড শীতের দেশে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কারণ সেই বরফজল গায়ে দেওয়া সহজ কথা নহে। যদি কখনও তাহারা গা হাত পা ধোয়, তাহাও জল দিয়া নয়; একপ্রকার দুর্গন্ধ অপরিষ্কার তরল পদার্থে তাহারা জলের কাজ করে। এস্কিমোরা সাঁতার জানে না; সেখানকার ঠাণ্ডা জলে সাঁতার দেওয়া এক রকম অসম্ভব। কোনও এস্কিমো মাতা যদি তাহার সন্তানকে একটু পরিষ্কার করিতে চায়, তাহা হইলে গরুর মত জিব দিয়া তাহার গা চাটিয়া পরিষ্কার করে। এইরূপ মাংস পাক করিয়া যদি তাহাতে বালি দৃষ্ট হয় তাহা হইলে পাচিকা আগে জিব দিয়া চাটিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া পরে তাহা পরিবেশন করে।

এস্কিমো পুরুষদের চুল পিঠের উপর ঝুলিয়া থাকে; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা চুল গুটাইয়া হরিণের চামড়ার ফিতা দিয়া মাথার উপরে বাঁধিয়া রাখে। কেহ কেহ বিইনী গাঁথিয়া কাঁধের উপর ঝুলাইয়া রাখে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা প্রায় একই রকমের পোষাক পরে। পুরুষেরা শীল মৎস্যের বা বল্গা হরিণের চামড়ার কোট পরে, কোটের পিছনে একপ্রকার ঝুলান টুপি থাকে; প্রয়োজন মত তাহা টানিয়া সমস্ত মাথা কাণ ঢাকা যাইতে পারে, কেবলমাত্র মুখ ও চোখ অনাবৃত থাকে। শীতকালে এই কোটের নীচে তাহারা আরও একটা চামড়ার কোট বা কুর্ত্তা পরে, এবং তাহার লোমের দিকটা গায়ের সঙ্গে লাগিয়া থাকে; তাহাতে বেশী গরম হয়। তাহাদের পাজামাও শীল, হরিণ বা ভালুকের চামড়ায় প্রস্তুত, এবং সাধারণতঃ পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত পড়িয়া জুতা ঢাকিয়া ফেলে। শীলের চামড়া চিবাইয়া নরম করিয়া তাহা দ্বারা এস্কিমোরা সুন্দর জুতা প্রস্তুত করে। জুতার তলা শক্ত শীলের চামড়ায় প্রস্তুত করা হয়। ভিতরে লোমযুক্ত চামড়া থাকে, তাহাতে পায়ে বেশ আরাম লাগে, মোটের উপরে এস্কিমোদের জুতা আমাদের জুতা অপেক্ষা ব্যবহারের পক্ষে অনেক বেশী সুবিধাজনক। ইউরোপের লোকেরা যদি কখনও এস্কিমোদের দেশে যায় তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই আপনাদের জুতা পরিত্যাগ করিয়া এস্কিমোদের জুতা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এতদ্ভিন্ন তাহারা হাতে দস্তানা পরে, এস্কিমোদের দস্তানায় আঙ্গুল নাই, সমস্ত হাতখানা একটা মোজার মত আবরণে আবৃত থাকে।

স্ত্রীলোকদের পোষাকও প্রায় এই রকমের, কেবল সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের কোটের পশ্চাতে আর একটী থলে থাকে, পথ চলিবার সময় তাহাতে সন্তানকে বসাইয়া দেওয়া হয়; শুধু তাহার মাথাটী বাহিরে থাকে এবং মায়ের কাঁধের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রয়োজনমত মা তাহার মুখে খাবারও দিতে পারে। মেয়েদের পাজামা অপেক্ষাকৃত ছোট ও খাটো; এবং তাহাদের জুতা সাদা শীলের চামড়ায় নির্ম্মিত ও হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত উঠে। ইহার মধ্যে আবশ্যকমত ছোট ছোট জিনিসও রাখিয়া দেওয়া যায়। সাধারণতঃ মেয়েদের পোষাকে লেস ইত্যাদি দ্বারা কিছু সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হয়। সচরাচর অসভ্য জাতিরা সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরিয়া থাকে। কিন্তু এখন এস্কিমোদের মধ্যে এই

প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মেয়েরা যেমন কানে ছিদ্র করিয়া গহনা পরে, কোনও কোনও স্থানের এস্কিমোরা নীচের ঠোঁটের প্রান্তে ছিদ্র করিয়া, তাহাতে হাড়, পাথর বা ধাতব শলাকা পরে।

শীল মাছ শীকারই এস্কিমোদের জীবনের প্রধান কাজ ও চিন্তারও বিষয়। ইহা হইতেই তাহাদের খাদ্য বস্ত্র, অস্ত্রাদি সংগ্রহ হইয়া থাকে। বল্গা হরিণের হাড়ে তাহারা এক প্রকার ধনুক প্রস্তুত করে, হরিণের শিরাতে ধনুকের ছিলার কাজ হয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা পাথর ইত্যাদির দ্বারা ছুরীও প্রস্তুত করে। তাম্রখনি নামক নদীর নিকটে একটী তাম্রের খনিও আছে, তাহা হইতে তাম্র সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারাও এস্কিমোরা ছুরী প্রস্তুত করিয়া থাকে। এস্কিমোদের মধ্যে কাঠের ব্যবহার বেশী নাই, কারণ তাহাদের দেশে কাঠ পাওয়া যায় না দূর দেশ হইতে বণিকেরাও কখনও কখনও কাঠ আনিয়া বিক্রয় করে, বা কখনও কখনও সমুদ্রের স্রোতে ভাসিয়া কাঠ আসে। কোনও কোনও স্থানে কাঠ এতই দুর্ল্লভ যে মূল্যবান হাতীর দাঁতে শীল শীকারের বর্শার বাঁট তৈয়ারি করা হয়। এস্কিমোদের নিকটে ভাঙ্গা দাঁড় বা তদনুরূপ কোনও কাঠের টুকরা অপেক্ষা মূল্যবান উপহার আর কিছু হইতে পারে না। আমরা যেমন

কায়াকে এস্কিমো।

সুন্দর ফুল বা স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য পদার্থের নামানুসারে ছেলেমেয়েদের নাম রাখি, এস্কিমোরা সেইরূপ সচরাচর "ক্রেমুক" এই নাম রাখে, তাহার অর্থ স্রোতে আনীত কাঠ। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, কাঠ তাহাদের নিকট কত মূল্যবান জিনিস। তাহাদের বর্শা ও ডাঙ্গস সুকৌশলে নির্ম্মিত। শীল, তিমি প্রভৃতি শীকারের জন্য তাহারা একপ্রকার বর্শা প্রস্তুত করে। তাহা সাত আট ফুট লম্বা কাষ্ঠদণ্ডে লাগান থাকে, এই কাষ্ঠদণ্ড শীল প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তু লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হয়। শীকারের গায়ে বর্শা লাগিলেই কাঠ খানা খুলিয়া যায়, এবং সমুদ্রের জলে ভাসিতে থাকে, তখন শীকারীরা তাহা কুড়াইয়া লয়। অপরদিকে বর্শার মুখ শীলের গায়ে গাঁথিয়া যায়; তাহাতে সরু দড়ি বাঁধা থাকে; এবং সেই দড়ির সঙ্গে চামড়ার ফাঁপা একটী থলে লাগান থাকে, তাহা জলে

ভাসিতে থাকে; তাহা দ্বারা আহত জন্তু কোথায় যায় তাহা জানিতে পারা যায়। শীল জলের মধ্যে ডুব দিলেও নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে মাঝে মাঝে উপরে উঠিতে হয়; শীকারীরা নৌকায় করিয়া তাহাদের অনুসরণ করে, এবং সুবিধা পাইলেই আবার তাহাকে বর্শা মারে এইরূপে যতক্ষণ সেটা মারা না পড়ে, ততক্ষণ তাহারা নৌকা করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া যায়।

এস্কিমোদের নৌকার নাম কায়াক, ইহার নির্ম্মাণে এস্কিমোদের শিল্প কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। ইহার আকৃতি তাঁতাদের মাকুর ন্যায়,—দুই মুখ সরু, মাঝ

এস্কিমোদের কুকুরও গাড়ী।

খানে চওড়া। তিমি মাছের হাড়ে ইহার কাঠাম গড়ান হয়, তারপরে লোমশূন্য শীলের চামড়ায় আগাগোড়া আবৃত করা হয়, কেবল মাঝখানে খানিকটা স্থান খালি থাকে। শীকারী এইখানে বসে, তাহার গায়ের কোট কায়াকের সঙ্গে বোতাম দিয়া আঁটিয়া দেয়; এই কোটের ভিতর দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে শীকারী যেন কায়াকের একটী অংশ বিশেষ হইয়া যায়। তারপরে দুই হাতে দস্তানা পরিয়া দোমুখা দাঁড় বাহিয়া দ্রুতবেগে সমুদ্রের মধ্যে চলা ফেরা করে। কখনও কখনও নৌকার সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে হাতীর

দাঁতের ভাঁটা দিয়া সাজান হয়। নৌকার সম্মুখে চামড়ার দড়িতে বর্শা, ছুরী প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখা হয়, এবং পশ্চাতে ফাঁপা শীল চামড়ার থলে প্রভৃতি থাকে।

এস্কিমোদের নৌকায় কোনও মতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। সমুদ্রে যতই ঢেউ হউক না কেন এস্কিমোরা দোমুখা দাঁড়ের সাহায্যে নিরাপদে সমুদ্রের মধ্যে বিচরণ করিতে পারে। তাহারা অনায়াসে নৌকা উল্টাইতে এবং সোজা করিতে পারে। কিন্তু যদি বরফে ধাক্কা লাগিয়া কোথাও ছিদ্র হইয়া যায় তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। নৌকা চালাইতে চালাইতে যদি সম্মুখে জমাট বরফ পড়ে, তাহা হইলে নৌকা জোরে চালাইয়া বরফের উপর উঠাইয়া দেওয়া হয়; তারপরে বোতাম খুলিয়া আরোহী নৌকা হইতে নামে, এবং নৌকা মাথায় করিয়া লইয়া যায়, আবার জল পাইলে সেখানে নৌকায় চড়ে। বেরিং প্রণালীর নিকট যে কায়াক দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে দুইটী গর্ত্ত থাকে, এবং একসঙ্গে দুইজন লোক তাহাতে চড়িতে পারে। আর এক রকমের নৌকা আছে, তাহার নাম ওমিয়াক। ইহাও হাড় ও চামড়ার দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু এগুলি চওড়া ও সমচতুষ্কোণ এবং উপরে খোলা। এই গুলিতে স্ত্রীলোক, বালক বালিকা, কুকুর প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকরাই ইহার দাঁড় টানে; এবং একজন বৃদ্ধ লোক হাল ধরিয়া থাকে।

এস্কিমোরা বল্গা হরিণ বশ করিতে শিখে নাই। তাহারা কুকুরের দ্বারা গাড়ী টানায়। এই গাড়ী দুইখানা সোজা কাঠে নির্ম্মাণ করা হয়; তাহার অগ্রভাগ উপরের দিকে উঠান; তাহার সঙ্গে চামড়ার দড়ি দ্বারা কুকুর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সোজা কাঠ দুখানির উপরে আড়াআড়ি আর কয়েকখানি কাঠ আঁটিয়া দেওয়া হয়; সুতরাং তাহার উপরে এক প্রকার বসিবার আসন হয়। গাড়ীর পশ্চাতে দুইটা কাঠের খুঁটা আঁটা থাকে এবং তাহার মাথায় আড়াআড়ি আর একখানি কাঠ বাঁধিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে জিনিস পত্র রাখিবার জন্য একটা আলনা হইয়া যায়। গাড়োয়ান এই গাড়ীর উপর বসিয়া ছড়ি হাতে শ্রেণীবদ্ধ কুকুরের দল চালায়। এস্কিমোদেশের কুকুর বড় বড়, দেখিতে অনেকটা নেকড়ে বাঘের মত। এক একখানি গাড়ীতে সাধারণতঃ ছয়টা কুকুর জোতা হয়। বরফ বেশী উঁচু নীচু না হইলে ইহারা ঘণ্টায় ষোল মাইল পথ চলিতে পারে। চালকের হাতে একগাছি চাবুক থাকে; তাহার বাঁটটী কাঠের; তাহাতে বিশ পঁচিশ ফুট লম্বা চামড়ার দড়ি লাগান থাকে; ইহার দ্বারা অভ্যস্ত চালকেরা বিশ পঁচিশ হাত দুরস্থ মাছিকেও লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিতে পারে।

আমের দর।

(গাথা।)

সকাল বেলা আমওয়ালা
আমের ঝুড়ী মাথে
বিক্‌তে এল পাকা আম
আমার দরজাতে!
মাণিক ভায়া ছুটে এল
কাছা-কোছা-খোলা
আমের নামে একেবারে
যেন আপন-ভোলা।
মাষ্টার মশায় পেঁছন থেকে
ডাকেন "দাঁড়!" "দাঁড়া"
কে শুনে ভাই, কার কথা
কে দেয় তখন সাড়া!
মাণিক বাবু নিজেই এসে
আমের দর করে,
আস্‌ছে রমেশ একটু খানি
সবুর নাহি ধরে!
আমওয়ালা বল্‌ল "বাবু,
বড়ই ভাল আম,
প্রতি টাকায় আঠারটী
হচ্ছে এর দাম!"

মাণিক বলে "ওকি কথা!
কখনও তা' নয়!
ষোলটী আম দাও টাকায়
সুবিধা তবে হয়!"
মাণিক ভায়ার কথা শুনে
আমওয়ালা চুপ,—
আমরা সবে হেসে আকুল
একি অপরূপ!
ষোলটী আম চায় মাণিক
সস্তা মনে করে,—
তাই আঠারটী আমের মায়া
ছাড়্‌ল অকাতরে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দুঃখীরা *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীন ভালজীনের মনে কি চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল কেহ তাহা বলিতে পারে না; এমন কি সে নিজেও তাহা জানিত না। তাহার মুখে একপ্রকার অদ্ভুত বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে যে তোলপাড় হইয়া যাইতেছিল তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশপের মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই। তাহার মুখের ভাবে মনে হইতেছিল যে সে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে যেন দুই অকূল পাথারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে—একদিকে জীবন অপর দিকে মৃত্যু। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আস্তে আস্তে তাহার বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া মাথার টুপি খুলিল, তৎপরে তেমনি ধীরে আবার তাহার বাম হস্ত নামাইল। বামহস্তে টুপি দক্ষিণ হস্তে সিঁদকাটি, এই ভাবে বিশপের মুখের দিকে তাকাইয়া আবার সে চিন্তাসাগরে মগ্ন হইল।

জীন ভালজীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিম্নে বিশপ শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সম্মুখে দেওয়ালের গাত্রে কার্ণিসে ক্রুশোপরি যীশু খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষীণচন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল—যেন বিস্তৃত বাহুযুগল একজনের জন্য আশীর্ব্বাদ অপরের জন্য ক্ষমা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। খানিক পরে জীন ভালজীন হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া টুপি মাথায় দিল; তার পরে দ্রুতগতিতে বিছানার পাশে পাশে অগ্রসর হইয়া বিশপের মুখের দিকে আর না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি দেওয়ালের গাত্রলগ্ন আলমারির সম্মুখে উপস্থিত হইল। হাতের সিঁদকাটি দিয়া আলমারির তালা ভাঙ্গিতে যাইতেছিল, কিন্তু তখন দেখিতে পাইল, তালাতে চাবি লাগানই আছে; চাবি দিয়া তালা খুলিয়া দেখিল, সম্মুখেই রৌপ্য আসবাবের টুকরী। সবেগে সেই টুকরী লইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া জানালার নিকটে আসিল। রৌপ্য আসবাবগুলি একে একে পকেটে রাখিয়া টুকরীটী ফেলিয়া দিল; তার পরে আপনার লাঠি লইয়া জানালা টপকাইয়া বাগানে নামিল, এবং দ্রুতগতিতে বাগান পার হইয়া বাঘের মত লাফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বিশপ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় পরিচারিকা ত্রস্তভাবে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট আসিল এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল "আপনি কি জানেন বাসনের টুকরী কোথায় আছে?" বিশপ স্থিরভাবে বলিলেন "হাঁ"। তখন পরিচারিকা বলিল "ভগবানকে ধন্যবাদ! আমি ভাবিতেছিলাম টুকরী কোথায় গেল!" ক্ষণকাল পূর্ব্বে ফুলগাছের মধ্যে বিশপ টুকরীটা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, এখন তাহা পরিচারিকার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "এই লও।" পরিচারিকা শূন্য টুকরী দেখিয়া বলিল "ইহাতে যে কিছুই নাই; রূপার বাসনগুলি কোথায়?" বিশপ বলিলেন "ওঃ, তুমি বাসনের জন্য ভাবিতেছ? বাসন কোথায় তাহা আমি জানি না।" "সর্ব্বনাশ, তবে তাহা চুরি গিয়াছে; কাল রাত্রিতে যে লোকটী আসিয়াছিল, সেই নিশ্চয় চোর।"

---

* ফরাসী গ্রন্থকার ভিক্টর হুগোর Les Miserables নামক গ্রন্থের বালকবালিকাদের উপযোগী বঙ্গানুবাদ।

নিমেষের মধ্যে পরিচারিকা গৃহের মধ্যে গমন করিল এবং যে আলমারিতে বাসন ছিল তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। টুকরীর ভাবে একটী ফুলগাছ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল . বিশপ তখন সেইটীকে দেখিয়া ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। পরিচারিকার পদশব্দ শুনিয়া তিনি মস্তকোত্তলন করিলেন।

পরিচারিকা নিরাশ ব্যঞ্জক স্বরে বলিল "লোকটী চলিয়া গিয়াছে ; বাসন চুরি গিয়াছে " এই কথা বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি বাগানের একপ্রান্তে পড়িল ; সেখানে দেওয়ালের গায়ে লাফাইয়া পার হওয়ার চিহ্ন ছিল ; প্রাচীরের মাথা একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া পরিচারিকা বলিল "ঐ পথ দিয়া সে গিয়াছে। কি ঘৃণার কথা। সে আমাদের বাসনগুলি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

বিশপ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, তৎপরে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন "ভাল কথা, সে বাসন কি আমাদের ?"

পরিচারিকা কোনও উত্তর করিল না। ক্ষণকালের নিস্তব্ধতার পর বিশপ আবার বলিলেন "দেখ, ঐ রৌপ্য দরিদ্রলোকদের, আমি অন্যায় করিয়া তাহা আমার ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছিলাম। ঐ লোকটী নিশ্চয়ই দরিদ্র, তাই লইয়া গিয়াছে।'

পরিচারিকা তখন বলিল "হা ভগবান! আমি বাসনের জন্য ভাবি না ; আমরা ভাবিতেছি আপনি কিসে আহার করিবেন।"

বিশপ বিস্মিতভাবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "কেন কাঁসার কাঁটা চামচ কি কিনিতে পাওয়া যায় না ?"

পরিচারিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "কাঁসার বাসনে দুর্গন্ধ হয় ?"

"তবে লোহার।"

পরিচারিকা বলিল "লোহাতে কসিয়া যায়।"

বিশপ বলিলেন "আচ্ছা তবে কাঠের।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কাল রাত্রিতে যে টেবিলে জীন ভালজীন আহার করিয়াছিল সেইখানে বসিয়া বিশপ তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহার ভগিনী কোনও কথা বলিতেছিলেন না। পরিচারিকা থাকিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিতেছিল। আহার করিতে করিতে বিশপ হাসিয়া বলিলেন "দুধে রুটী ডুবাইয়া খাইতে কাঠের কাঁটা চামচেরও প্রয়োজন হয় না।"

পরিচারিকা কাজ করিতে করিতে বলিতেছিল "এরকম লোককে ঘরে স্থান দেওয়া ও পাশের ঘরে শুইতে দেওয়াই ভুল। ঈশ্বরের দয়া বলিতে হইবে যে সে শুধু বাসন লইয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি আর কিছু করিত। মাগো! ভাবিতেই গায়ে কাঁটা দেয়!"

ভাই বোন যখন প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া উঠিতেছিলেন সেই সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। বিশপ বলিলেন "ভিতরে আসুন।"

তৎক্ষণাৎ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং এক অদ্ভুত দৃশ্য দ্বারদেশে দেখা গেল। তিন জন লোক অপর এক জন লোককে বলপূর্ব্বক ঘাড়ে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ তিন জন লোক পুলিসের পাহারাওয়ালা, চতুর্থ ব্যক্তি জীন ভালজীন। একজন প্রহরী, যাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে সে পাহারাওয়ালাদের নেতা, ঘরের ভিতরে আসিয়া সসম্ভ্রমে হস্তোত্তলন করিয়া বিশপকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "স্বামীজি।"

জীন ভালজীন এতক্ষণ মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সম্বোধন বাক্যে সে মাথা তুলিয়া বিস্মিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল "স্বামীজী, তবে ইনি গ্রাম্য পুরোহিত নন ?"

একজন পাহারাওয়ালা বলিল "চুপ! ইনি লর্ড বিশপ।"

ইতিমধ্যে বিশপ বৃদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও যথাসম্ভব দ্রুতপদে জীন ভালজীনের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন 'বেশ, আপনাকে পাওয়া গিয়াছে ; আমি আপনাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যে আপনাকে বাতিদানী দুইটীও দিয়াছিলাম ; তাহাও রৌপ্য নির্ম্মিত, দুইশত

ফ্রাঙ্কের কম মূল্যের হইবে না। আপনি তাহা লইয়া যান নাই কেন?" এই কথা শুনিয়া জীন ভালজীনের চক্ষুদ্বয় প্রসারিত হইল এবং সে বিশপের দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকাইল যাহা পৃথিবীর কোনও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

পুলিস প্রহরী তখন বলিল "স্বামীজী, তাহা হইলে এই লোকটী আমাদিগকে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। আমরা পথে ইহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম; ইহার ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক দেখিয়া ইহাকে বন্দী করিয়াছিলাম; ইহার কাছে এই রৌপ্য বাসন—"

বিশপ তাহাকে তাহার কথা শেষ না করিতে দিয়াই হাসিয়া বলিলেন;—"এবং ইনি তোমাদিগকে বলিয়াছেন যে এগুলি একজন বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক, যাঁহার গৃহে তিনি গতরাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দিয়াছেন। আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। তোমরা সন্দেহ করিয়া ইঁহাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছ। সেটা ভুল হইয়াছে।"

পুলিশ প্রহরী বলিল "তাহা হইলে আমরা ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

বিশপ বলিলেন "অবশ্য।"

পাহারাওয়ালারা তখন জীন ভালজীনের ঘাড় ছাড়িয়া দিল। সে আড়ষ্টভাবে একটু পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং তৎপরে স্ফুটস্বরে যেন আপন মনেই বলিল "একি সত্য ঘটনা? আমি কি মুক্তিলাভ করিয়াছি।"

একজন পাহারাওয়ালা বলিল "হাঁ, তুমি এখন যাইতে পার।"

বিশপ বলিলেন "বন্ধু যাইবার সময় আপনার বাতিদানী দুইটী লইয়া যান।"

এই বলিয়া তিনি দেওয়ালের গায়ে কার্ণিসের উপরে যেখানে রৌপ্য বাতিদানী দুইটী ছিল সেখানে গেলেন, এবং সে দুইটী আনিয়া জীন ভালজীনের হাতে দিলেন। বাড়ীর স্ত্রীলোক দুইজন নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে এই ঘটনা দেখিতেছিলেন; তাঁহাদের মুখে এমন কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই যাহাতে বিশপের প্রশান্ত ভাবের ব্যাঘাত জন্মিতে পারিত। জীন ভালজীনের সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে বিস্মিতনয়নে বিনা চিন্তায় কলের মত বাতিদানী দুইটী গ্রহণ করিল।

তৎপরে বিশপ বলিলেন "আচ্ছা, আপনি এখন নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারেন। ভালকথা, আপনার আবার আসিবার প্রয়োজন হইলে সদর দরজা দিয়াই আসিবেন; কারণ দিনরাত্রি সদর দরজা খোলা থাকে, চাবি বন্ধ করা হয় না। বাগান দিয়া যাতায়াতের প্রয়োজন হইবে না।" পাহারাওয়ালাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তোমরা এখন যাইতে পার।"

তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। জীন ভালজীনকে দেখিয়া মনে হইতেছিল সে বুঝি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। বিশপ ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া বলিল "তুমি কখনও ভুলিও না যে এই অর্থ তুমি নিজেকে সংশোধন করিবার জন্য ব্যবহার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ।"

জীন ভালজীনের মনে হইল না কখন সে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিশপ তখন আবার গম্ভীরস্বরে বলিলেন ঃ—

"জীন ভালজীন! ভাই! তুমি এখন আর অসৎবুদ্ধির নও; এখন হইতে তুমি ধর্ম্মবুদ্ধির! আমি তোমার নিকট হইতে তোমার আত্মা ক্রয় করিয়া লইয়াছি। আমি তোমার আত্মাকে মন্দ চিন্তা ও বিনাশের পথ হইতে ফিরাইয়া ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিলাম!"

(ক্রমশঃ)

স্বর্গের পাখী।

[Bird of Paradise]

কোন্ দেশেতে বাড়ী তব
স্বরগের পাখী?
কে দিয়াছে বল তোমায়
অমনতর আঁখি?
রামধনুর সে নানা বরণ
আনলে কোথা থেকে?

ইচ্ছা করে, ভালবাসি
তোমার সাথে রেখে।
তোমার সাথে উড়ে উড়ে,
গেলে তোমার দেশে,
সত্য করে বল পাখী, কাঁদতে
হবেনাত শেষে ?
তোমার দেশে পাব কিগো,
এমন তর বাড়ী ?
তৈরি ক'রে দিবে আমায়
ছোট্ট খেলার গাড়ী ?
আম বাগানে আছে কিগো
দোলনা দিতে দুল ?
ঘরের পাশে নানা রঙ্গের
নূতন গাঁদা ফুল ?
মায়ের আদর পাব সেথা
দিদির ভালবাসা ?
"ভুলু"র মত খেলার সাথী
করবে যাওয়া আসা ?
"মেনি"র মত বিড়াল ছানা,
কুকুর "ভোলার" মত,
পাব কিগো এমনতর
পায়রা, হাঁস যত ?
যদি বল, তোমার দেশে
অভাব এদের নাই,
তবে বড় ইচ্ছা আমার
সেই দেশেতে যাই।
এস, তবে আমার পাশে
ধরি তোমার গলে,
দুই জনাতে সেই দেশেতে
আজই যাব চ'লে॥

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

কা'লে পাওয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চাকরীর চেষ্টায় এক পিতৃবন্ধুর নিকটে গেলাম। তিনি আমার অবস্থা-পরিবর্ত্তনে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এত অল্পবয়সে এরূপ অল্প লেখা পড়া শিখিয়া ভাল চাকরির আশা করিতে পার না। তবে যদি রেঙ্গুণে যাইতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি চাকরি পাইতে পার। বিদেশে অধিক দিন থাকিতে হইবে না। দুই মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে, তখন কলিকাতাতেই চাকরি করিতে পারিবে।" অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলাম। "কল্য প্রাতে ছয় ঘটিকার পূর্ব্বে ষ্টীমারে উপস্থিত হইও" বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন।

মাতাঠাকুরাণী এ সংবাদে কাঁদিতে লাগিলেন ও আমাকে এতদূরে যাইতে বার বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু না যাইয়া উপায় কি ? ভাল পাশ করিতে পারিলে বিনা বেতনে কলেজে পড়িতে পাইতাম, তাহা হইল না। মাহিনা দিয়া পড়াও হইয়া উঠিতেছে না। এরূপ অবস্থায় চাকরি ভিন্ন আর গতি কি আছে ? আর দশ পনর টাকার চাকরি করা অপেক্ষা প্রথমেই পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরি মন্দ কি ? আর বিদেশ যাইবার কথা, তাহা না করিলে অল্প বিদ্যায় ভাল চাকরি হয় কৈ ? তাহার উপর আমার আর একটা মতলব ছিল। রেঙ্গুণে যাইয়া অনেক নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাইব, অনেক নূতন আচার ব্যবহারের পরিচয় পাইব, কখনও সমুদ্র দেখি নাই, তাহা দেখিয়া হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিব। এই সমস্ত উপাদান অবলম্বনে এক গ্রন্থ রচনা করিতে পারিব, যাহা এই অল্প বয়সেই আমার নাম অমর করিয়া তুলিবে। অল্পবিদ্যার নিন্দা আর সহ্য করিতে হইবে না। শিবচন্দ্র হয়ত তখন এফ্ এ পাশ করিবে, কিন্তু আমি তখন কি হইব ?—বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকার!

শিবচন্দ্রের গৌরব খর্ব্ব করিতে পারিব, এই আনন্দে আমাকে যেন আত্মহারা করিয়া তুলিল। আমি মন স্থির করিলাম—নিশ্চয়ই রেঙ্গুণে যাইব। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কেবল আমার ভবিষ্যৎ গ্রন্থের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। পুস্তকখানির আকার কিরূপ হইবে, কিরূপ অক্ষরে ছাপাইব, মলাটখানি কাপড়ে বা কাগজে বাঁধাইব, সোনার জলে মলাটের উপর আমার নাম লিখিব কি না, কয়খানি ছবি দিব, ভূমিকায় কি কি কথা লিখিব, ইত্যাদি চিন্তায় ঘুম হইল না; শেষে মাথা গরম হইয়া উঠিল, যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না; কিন্তু যখন ঘড়ির শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখিলাম সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাতাঠাকুরাণীকে দুই একটি মাত্র কথা বলিয়া ও তাঁহার পদধূলি লইয়া পথে বাহির হইলাম। প্রথমে ছুটিতে লাগিলাম, শেষে হাঁফাইয়া পড়িলাম। ছয়টা বাজিতে আর দশ মিনিট মাত্র বাকি আছে। যতই ছুটি না কেন, কোন মতেই ষ্টীমার ধরিতে পারিব না। আমার চোখে জল আসিতে লাগিল। যদি সমস্ত রাত্রি বৃথা চিন্তায় অতিবাহিত না করিতাম, তাহা হইলে সুনিদ্রাও হইত, ও যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গও হইত। একখানি ঘোড়ার গাড়ী যাইতেছিল। একটাকা ভাড়া স্বীকার করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়োয়ান জোরে চাবুক মারিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। ছয়টা বাজিতে পাঁচ মিনিট—চারি মিনিট—তিন মিনিট—দুই মিনিট—এক মিনিট শেষে ঢং ঢং করিয়া গির্জ্জার ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গেল। আমি গাড়ীর ভিতর হইতে "আরও জোরে চালাও—আরও জোরে" বলিয়া হাঁকিতে লাগিলাম। ষ্টীমার ঘাটের নিকটে আসিয়াছি, ঐ রেঙ্গুণের জাহাজ দেখা যাইতেছে—জাহাজের চিমনি হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে—পিছনের পাখা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতেছে। আর দু'ঘা চাবুক। ঘাটে গাড়ী থামিতে না থামিতেই লাফাইয়া পড়িলাম—পিছনে না চাহিয়াই ভাড়ার টাকাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম—পণ্টুনে যাইবার সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়াছি অমনি বংশীধ্বনি করিয়া জাহাজ ছাড়িয়া গেল! আমি উন্মত্তের ন্যায় তথাপি ছুটিতেছিলাম, এমন সময় পাহারাওয়ালা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। সে না ধরিলে বোধ হয় গঙ্গায় পড়িয়া যাইতাম।

আমি সেইখানে বসিয়া পড়িলাম, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিতেছিল, জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছিল। কতক্ষণ এ ভাবে বসিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম আমি এক গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া আছি, আর আমার চতুর্দ্দিকে লোকের ভিড় হইয়াছে। একজন আমাকে বাতাস করিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—শিবচন্দ্র!

সে দিন কলেজের ছুটি। শিবচন্দ্র প্রাতঃকালে দুই একজন বন্ধুর সহিত গঙ্গাতীরে প্রাতর্ভ্রমণে আসিয়াছিল। শিবচন্দ্রকে দেখিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেলাম। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, "ভগবান্ ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু হইল না কেন?" কিন্তু, হায়, যে ইচ্ছা করিয়া কালের ক্রীতদাস হয়, তাহার জন্য ত ভগবান্ এইরূপ দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন!

মরমে মরিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলাম। পাঁচ ছয় দিন কাহারও সহিত লজ্জায় মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিলাম না। ক্রমে লজ্জা দূর হইতে লাগিল। ভাবিলাম, "উঠিতে গেলেই পড়িতে হয়। যে জীবনে কখনও না ঠেকে সে কখনও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। আশা ছাড়িব না। কা'ল হইতে আবার চাকরির চেষ্টা করিব।" আবার কা'ল!

চাকরি মিলিল। এক সওদাগরি আপিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্য পাইলাম। পদের বেতন পঁচিশ টাকা, কিন্তু সাহেব আমার ইংরেজী লেখায় সন্তুষ্ট হইয়া পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।

আমি মন দিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার প্রতি আমার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। বড় সাহেব আমার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিলাতে

যে সমস্ত চিঠিপত্র পাঠাইতে হইত, তাহা তিনি বলিয়া যাইতেন, আর আমি লিখিতাম। আমার লেখা পরিষ্কার ছিল, বানান ভুল একটিও হইত না। দুই বৎসর না যাইতে যাইতেই আমার বেতন ষাট টাকা হইল। যে দিন বড় সাহেব আমার বেতন বাড়াইয়া দিলেন, সেই দিনই বিকালে পরীক্ষার খবর বাহির হইল যে শিবচন্দ্র এফ্ এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। শিবচন্দ্র এবার বি এ ক্লাসে পড়িবে। পরে বি, এ, এম্ এ প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের উকিল হইতে পারে। ক্রমে সে যে হাইকোর্টের জজ হইবে না, এ কথা কে বলিল? বরং আমার পক্ষে সে পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। কেন রুদ্ধ হইয়াছে বলিতে পার? আমাকে কা'লে পাইয়াছিল, শিবচন্দ্রকে কা'লে পায় নাই!

যাহাহউক, গ্রন্থকার হইবার আশা আমি পরিত্যাগ করি নাই। বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকার—অক্ষয় যশ—অমরত্ব! এই নেশাতেই আমি ভোর হইয়া থাকিতাম। আমি বিখ্যাত ইংরাজ লেখকগণের গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে লাগিলাম। বেশ পরিশ্রম করিয়া আগাগোড়া পড়া নয়—কেবল সখের পড়া। যেটা ভাল লাগিত সেই টাই পড়িতাম। নূতন নূতন বই কিনিতাম, কিন্তু যেমন এক এক জন লোক আছে যাহারা খাইতে বসিয়া উপস্থিত সকলপ্রকার খাবার একটু একটু খাইয়া সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যায়, আমিও সেইরূপ যে সমস্ত বই কিনিতাম নিজের ইচ্ছামত তাহাদের স্থানে স্থানে পড়িয়া ফেলিয়া রাখিয়া দিতাম। ইহাতে যে মনের তেজ কমিয়া যায়, চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পাইতে থাকে, তাহা বুঝিতাম না। আমি পড়িতাম যত, তাহা অপেক্ষা বৃথা চিন্তায় কাল কাটাইতাম আরও বেশী। কখনও ভাবিতাম, আমি যখন বড় লোক হইব, তখন কত লোক কত প্রয়োজনে আমার নিকটে আসিবে, লোকে আমার কত সুখ্যাতি করিবে, কত সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিব, কত দরিদ্রের অভাব মোচন করিব। আবার কখনও ভাবিতাম, আমি বাঙ্গালা ভাষায় যে সব অমূল্য গ্রন্থ লিখিব, কত দেশে কত ভাষায় তাহাদের অনুবাদ হইবে, রাজা হইতে দরিদ্র ভিখারী পর্য্যন্ত আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কত আনন্দ ও শিক্ষা পাইবে, এবং আমায় কত ধন্যবাদ করিবে। কখনও যেন দেখিতাম আমার স্কুলের সহপাঠিগণ আমার কাছে বসিয়া আমার স্তুতিবাদ করিতেছে, শিবচন্দ্র নিজমুখে স্বীকার করিতেছে যে সে যেন একটী ক্ষুদ্র তারা আর আমি সহস্ররশ্মি দিবাকর।

কিন্তু যে প্রত্যহ আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরে যশের পারিজাত মালা তাহার ভাগ্যে ঘটে না; যে শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণ করে তাহাকে অবশেষে তরুতলই আশ্রয় করিতে হয়। আমি আকাশকুসুমের মালায় মণ্ডিত হইয়া স্বরচিত শূন্য সৌধে সুখে বাস করিতেছি, এমন সময় একদিন সংবাদ পাইলাম শিবচন্দ্র এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ-পদক পাইয়াছে। আর আমি ৮৫্ টাকা বেতনে সওদাগরি আপিসে কেরাণীগিরি করিতেছি। যে গ্রন্থ লিখিয়া অমরত্ব লাভের আশা করিয়া বসিয়া আছি সে গ্রন্থের একছত্রও এপর্য্যন্ত লেখা হয় নাই! কা'ল হইতে নিশ্চয়ই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিব। আজ আর সে কথায় কাজ নাই। আষাঢ় মাসের "মুকুল" পড়িও, আমি কিরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম দেখিতে পাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ।

নস্য ও সিগারেট।

এক দিন প্রাতঃকালে একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে শ্রীরামপুর যাইতে হইয়াছিল। বেলা নটার মধ্যে শ্রীরামপুরে না পৌঁছিলে, আমি যে কার্য্যের জন্য যাইতেছিলাম, সে কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই তাড়াতাড়ি প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাসা হইতে বাহির হইলাম। ঘড়িতে দেখিলাম তখন সাড়ে

ছয়টা বাজিয়াছে। আমার যেখানে বাসা—সেখান হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া হাবড়া ষ্টেসনে পৌঁছিতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। আমি দেখিলাম আমি যদি সাতটার সময় ষ্টেসনে পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে তখনই একখানি গাড়ী পাইতে পারি; নতুবা সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইবে। সাড়ে আটটার ট্রেণে গেলে আমার কাজ হয় না। এইজন্য একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়োয়ানকে বলিলাম, আমাকে সাতটার পূর্ব্বেই হাবড়ায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। গাড়োয়ান অধিক ভাড়া পাইবার লোভে খুব জোরে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সময় যে গঙ্গার সেতু খোলা ছিল তাহা আমি জানিতাম না; গাড়োয়ান সে খবরই রাখে না। গঙ্গার সেতুর নিকট যাইয়া দেখি ওপারে গাড়ী যাওয়ার উপায় নাই। গাড়োয়ান বলিল "বাবু, পোল খোলা।" আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পারের ষ্টীমারের দিকে গেলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি ঘাটের নিকট যাইতে না যাইতেই ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখি তখন সাতটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। বুঝিলাম কোন উপায়েই আর সাতটার গাড়ী পাওয়া যাইবে না;—তখন তাড়াতাড়ি করা নিরর্থক মনে করিয়া পারের ষ্টীমার পুনরায় এপারে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই স্থির করিলাম। সাড়ে-আটটার গাড়ীতেই শ্রীরামপুর যাইতে হইবে। যদিও বুঝিলাম যে, নটার পরে শ্রীরামপুর পৌঁছিলে কার্য্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, তবুও একবার যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একজন মাঝি আসিয়া বলিল "বাবু, পারে।" আমি বলিলাম "হাঁ, পারে যাব। কি নিবি!" সে বলিল "আমার বোটে একটি লোক হয়েছে, আর আপনি যদি চার আনা পয়সা দেন, তবে অন্য লোক নেব না, এখনই বোট ছেড়ে দেব।" আমি বলিলাম "দশমিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে বিনি পয়সায় পার হয়ে যাব; তারই জন্য চার আনা পয়সা দিতে পারি না; আমার তেমন তাড়াতাড়ি নেই।" মাঝিও নাছোড়বন্দা। সে বলিল "আচ্ছা বাবু, আপনি দুআনা পয়সা দেবেন, আর যদি এখনই দুই-একটা লোক পাই তা হ'লে তুলে নেব।" আমি বলিলাম "তা নয় বাবু, আমি চারটা পয়সা দেব, আর তুমি বিলম্ব করতে পাবে না। এতে যদি স্বীকার হও, তবে চল, নৌকায় উঠি। তা যদি না পার, তবে অন্য চেষ্টা দেখ গিয়ে।" মাঝি একটু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল "যাক্ আচ্ছা বাবু, আপনি ভদ্রলোক, ছয়টা পয়সা দেবেন। আমি আর কারোর জন্য দেরী করব না।" ষ্টীমারের জন্য কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব; যাক্ ছয়টি পয়সা বইত নয়। বেশ আরামে যাওয়া যাবে। এই ভাবিয়া আমি বলিলাম "আচ্ছা, ছয়টি পয়সাই দেব, কিন্তু এখনই নৌকা ছাড়তে হবে, বিলম্ব করলে কিন্তু পয়সা পাবে না বাপু!" মাঝি বলিল "একটুও দেরী করিব না বাবু! আপনি উঠে বস্‌লেই ছেড়ে দেব।" আমাকে এই কথা বলিয়াই সে আবার ডাকিতে লাগিল 'পারে বাবু, পারে।" আমি বলিলাম "আবার পারে কি রে, চল্।" সে তখন ধীরে ধীরে নৌকার দিকে চলিল এবং "পারে বাবু পারে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু আর কেহই তাহার চীৎকারে কর্ণপাত করিল না, কেহই পারে যাইবার জন্য আসিল না। মাঝি নৌকায় উঠিয়াও একটু এদিক ওদিক করিতে লাগিল; একটু সময় পাইলে যদি পারে যাইবার জন্য আর কেহ আসে! কিন্তু তাহার সে আশা সফল হইল না—কেহই আসিল না। সে তখন অগত্যা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আমি নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলে নৌকার মধ্যে বসিয়া আছে। সেই একমাত্র আরোহী। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কোথায় যাবে বাবু!" বালক বলিল "বদ্যিবাটী!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সেখানেই কি তোমাদের বাড়ী?" বালক বলিল "না, সেখানে আমাদের বাড়ী নয়; আমাদের বাড়ী জয়নগরে! আমরা এখন বৈদ্যবাটীতেই থাকি।" আমি বলিলাম "সেখানে কি

তোমার বাবা কাজকর্ম্ম করেন ?', বালকটী বলিল "না, বাবা সেখানে চাকরী করেন না। বৈদ্ধবাটীতে আমাদের আড়ত আছে। আমরা সেখানেই এক রকম বাড়ী করেছি, দেশে আর যাওয়া হয় না।" এত বলিয়াই বালকটি পকেট হইতে একটা ছোট ডিবে বাহির করিয়া এক টিপ নস্য লইল। আমি ত অবাক্! বাবা, এইটুকু ছেলে, এখনও দুধের দাত সবগুলি পড়ে নাই, এখনই এই ছেলে নস্য লইয়া থাকে। বোধ হয় তাহার পকেটে ইহা অপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর আর কেহ থাকিতে পারেন।

বালকের নস্যগ্রহণ শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি পড়াশুনা কর, না আড়তের কাজকর্ম্ম দেখ ?" বালক বলিল "আমি ত পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আড়তে বস্‌তেই চেয়েছিলাম, বাবাও তাই ব'লেছিলেন। মা সে কথা শুন্‌লেন না; তাই আমি এখন সেখানকার ইংরাজী স্কুলে পড়ি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন্ ক্লাসে পড় ?" সে বলিল "ফোর্থক্লাস সেক্‌সন বি।" আমাদের নৌকা তখন মাঝগঙ্গায় গিয়াছে।

ছেলেটীর কতদূর বিদ্যা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বলিলাম "তোমার পকেটে সিগারেট আছে ?" বালকটী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আছে।" আমি বলিলাম "তা হ'লে তুমি নস্যও নাও, সিগারেটও খাও। তামাক ?" বালক বলিল "না, তামাক খাই না।" আমি বলিলাম "বাপু, এই সিগারেট আর নস্য কতদিন হ'লো ধরেছ।" বালকটি বলিল "বেশী দিন নয়—এই দুইতিন বৎসর।" আমি বলিলাম "তোমার বয়স কত ?" সে বলিল "এই পনর বৎসরে পড়েছি।" আমি বলিলাম "তা হ'লে বারবছর বয়সের সময় থেকেই এ দুইটা ধরেছ। তা এ তিনবছরে ত তেমন উন্নতি করতে পার নাই।"

বালক বোধ হয় আমার কথাটা বুঝিতে পারিল না; তাই সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম "আমার কথাটা বোধ হয় তুমি বুঝতে পার নাই। আমি বল্‌ছিলাম কি, যে তিন বছর আগে ত তুমি সিক্সথ (sixth) ক্লাসে ছিলে, এই তিনবছর পর পর প্রোমোসন পেয়ে ফোর্থ ক্লাসে উঠেচ। কেমন ? এরই নাম উন্নতি। তেমনই তিনবছর আগে যদি তুমি সিগারেট আর নস্য ধরে থাক, তা হলে এ তিনবৎসরে তোমার অন্ততঃ তামাকের ক্লাস থেকে প্রোমোসন নিয়ে গাঁজার ক্লাসে উঠা উচিত ছিল। তাই বল্‌ছিলাম, এদিকে ত তোমার তেমন উন্নতি হয় নাই।" বালক আমার এ কথার আর উত্তর দিতে পারিল না, বোধ হয় একটু লজ্জা হইল।"

আমি তখন পুনরায় বলিলাম "দেখ বাপু, মনে কিছু কোরো না। তোমার বয়স এখন চৌদ্দ কি পনর। এখনই তুমি দুই দুইটা নেশা করতে আরম্ভ করেছ। এর পর যখন আর একটু বড় হবে, তখন তোমার কি হবে, সে কথাটা ভেবে দেখেছ ? এখন লেখাপড়া শিখ্‌বে, ভাল ছেলে হবে। তা নয় নস্য টেনে, সিগারেট মুখে দিয়ে বেড়ান কি উচিত। আমি জানি তোমার মত বয়সের কয়েকটি ছেলে এই রকম ছেলেবেলায় নস্য আর সিগারেট ধরেছিল। শেষে দেখি কি, তারা প্রায় সব গুলোই কোকেনখোর হয়ে প'ড়ল; দুইএকজন গাঁজা খেতে আরম্ভ করল। তার পর আর কি ? দুই তিন বছর যেতে না যেতেই সব শেষ হয়ে গেল। তারা প্রায় সকলেই ভদ্রলোকের ছেলে; আগে লেখাপড়ায়ও খুব মন ছিল। কিন্তু যাই ঐ সকলের একটা ধর্‌ল, তার পর থেকেই অধঃপতন সুরু হলো. শেষে কুড়ি বছর বয়স হতে না হতেই তারা অনেকেই মারা গেল। এত অত্যাচার শরীরে সইবে কেন ? দেখ বাপু, তুমি ভদ্র লোকের ছেলে, লেখাপড়া করছ। বাপ মা কত আশা ক'রে তোমাকে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন, তোমার কি এই বয়সে এই সব নেশা করা ভাল ? তোমার মনে কি একটা কথাও বলে না ? এ কাজ যে অন্যায়, একথা কি তোমার একবারেও মনে হয় না ? তারপর এর ফল কি, তা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি। এই সব দেখেশুনে কি তোমার মনে কিছুই বলে না।"

এই সময় নৌকা হাবড়ার পারে লাগিল। আমরা দুইজনই তীরে উত্তীর্ণ হইলাম। আমি তখন বালকটিকে

বলিলাম "তুমি ত বৈদ্যবাটী যাবে, আমি শ্রীরামপুর যাব, চল এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। তোমার কি রিটার্ন টিকিট আছে?" বালক বলিল "আছে।" আমি বলিলাম "তবে তুমি একটু দাঁড়াও আমি একখানি টিকিট কিনে নেব।" এই বলিয়া আমরা ষ্টেসনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি টিকিট কিনিয়া আসিয়া দেখি ছেলেটী আমার জন্য দাঁড়াইয়া নাই। ষ্টেসন ঘরের মধ্যেও চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। প্লাটফরমে গাড়ী দাড়াইয়াছিল; সেখানেও যাইয়া দেখিলাম, বালকটী কোথাও নাই। তখন বুঝিলাম, সে আমার বক্তৃতার হস্ত হইতে নিস্তার লাভের জন্য গাঢাকা দিয়াছে; হয় ত আমি যে গাড়ীতে যাইব, সে সেই গাড়ীতেও উঠিবে না।

এই সকল ছেলেকে সুপথে আনিবার জন্য কি কোন চেষ্টাই করা যায় না? যাইবে না কেন? কিন্তু করে কে? মাষ্টার মহাশয়েরা না কি বই পড়াইয়াই সময় পান না, তারা এ দিকে দৃষ্টি করিবেন কখন? কিন্তু নেশার ক্লাসে ক্রমেই প্রোমোসন পাইবার চেষ্টা করিতেছে। পনর বছরের ছেলে নস্য ও সিগারেট টানে। এই ছেলে যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে আবকারীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইবে। কিন্তু এ সব ছেলে কি ততদিন বাঁচিবে?

শ্রীজলধর সেন।

হিরণ কন্যা।

(গল্প)

ছোট একটি মেয়ে, মেয়েটির নাম হিরণ। মেয়েটি রূপে যেন লক্ষ্মী, গুণও তেমনি। তা হলে হবে কি! মেয়েটির কিন্তু দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। হিরণের বয়স যখন দু'বৎসর, তখন তার মা মারা গেল। বাপ আবার বিয়ে করে এল। তার পর হিরণের একটি বোন হল। বোনটির নাম, বাপ রাখ্‌লে কিরণ।

কিরণ কিন্তু দেখতে হিরণের মত হল না। তার রঙ কালো, নাকটা মোটা, কপাল উঁচু, চোখদুটো ছোট্ট কুঁচের মত আর মাথায় তার চুল একরত্তিটুকু। হিরণের রঙ যেন টাট্‌কা চাঁপা ফুল, মাথায় কোঁকড়া কালো চুলের রাশি, জলের ঢেউয়ের মত পিঠ বেয়ে পড়ছে। দুটি বোন পথের ধারে খেলা করে বেড়ায়। দুধারি পথের লোক হিরণের পানে চেয়ে বলে, "আহা, কাদের মেয়ে গা! যেন আকাশ থেকে পরী নেমে এসেছে।" হিরণকে তারা কোলে তুলে নেয়, আদর করে, হাতে তার কত খেলানা দেয়, পুতুল দেয়, কিরণের পানে কিন্তু কেউ ফিরেও চায় না। রাগে হিংসেয় দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিরণ সাপের মতই ফুঁস্‌তে থাকে। বোনটির শুকো মুখ দেখে হিরণ ছুটে আসে; তাকে খেলানার ভাগ দেয়, খাবারের ভাগ দেয়, সে রাগে দূর করে সব পথের ধারে ছড়িয়ে ফেলে দেয়। ছল-ছল চোখে হিরণ শুধু তার বোনের কীর্ত্তি দেখে ভয়ে একটি কথাও সে কইতে পারে না।

বাড়ী গিয়ে কিরণ মার কাছে সব কথা লাগায়—মা তখন হিরণকে পঞ্চাশ কথা শুনিয়ে দেয়। হাজার হোক্ সে সৎমা কি না, নিজের মেয়েটি দেখতে কদাকার, তাকে কেউ আদর করে না—তার সমস্ত ঝাল সে হিরণের উপর দিয়েই মিটিয়ে নেয়। হিরণ ভালো মানুষ। সে শুধু চোখের জলেই ভেসে সারা হয়—মুখ ফুটে তবু এ-টুকু সে বলতে পারে না, "ওগো, পথের লোক এসে আমায় যদি আদর করে, তাতে আমার কি হাত! আমি ত তাদের মানা করিনি যে, আমার ছোট বোনটিকে কেউ আদর করো না, খেলানা দিয়ো না, ও দেখতে ভারী কুশ্রী!"

এমনই ভাবে দিন যায়—হঠাৎ একদিন হিরণের বাপও মারা গেল। বাপ তবু সৎমার আড়ালে হিরণকে একটু-আধটু আদর করত। বাপের ভয়েই সৎমা হিরণকে বকুক-ঝকুক, তার গায়ে কখনও হাতটি ওঠাতে সাহস করেনি। এখন সে বাপ আর নেই, কাজেই সৎমার রাগের ঝাঁজ কথাতেই শুধু আর ফুটে শেষ হত না; কিলটা-চাপড়টার মধ্যেও ফুটে বেরুতে লাগল হিরণের আর কষ্টের শেষ রইল না। সংসারের সব

কাজই তাকে করতে হত। রান্না-বান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, সমস্তই তার করা চাই। কতটুকুই বা মেয়ে—কিন্তু তা বললে কি হয়! সৎমার শরীর খারাপ, রান্নাঘরে আগুন-তাপে গেলে তাঁর মাথা ধরে, কোমরে বাত, ঝাঁট দেওয়া কি বাসন মাজা কি তাঁর সামর্থ্যে কুলায়! আর কিরণ? সে ত ছেলে মানুষ, সে খেলাবে, না, কাজ করবে? কাজেই সব কাজ হিরণকে করতে হয়। তবু সে তার জন্য কোন দিন এতটুকু দুঃখ জানায়নি, হাসি মুখে সব কাজ করে যায়!

কিন্তু তার কষ্ট হত, সেই সময়, যখন সন্ধ্যার পর পথ দিয়ে গল্প করতে করতে মেয়েরা সব কলসী কাঁখে পুকুর-ঘাটে জল আনতে যেত। তার তখন আগেকার কথা মনে পড়ত। বাপ তখন বেঁচে ছিল, এত কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটেও তাকে চাপা থাকতে হত না—সে-ও এই সন্ধ্যা বেলায় কলসীটি নিয়ে পুকুরে জল আনতে যেত। ও-পাড়ার ঊষা, নিশা, কমলা, সরলা,—তাদের সঙ্গে পুকুরে ঘড়া ভাসিয়ে সাঁতার কাটা—পুকুরের কালো জলে ছোট ছোট ঢেউগুলি হাসির মত ফুটে উঠত, সেই জলে গা ভাসিয়ে সাঁতার—সৎমার দেওয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিমেষে সে ভুলে যেত। ও-পারে আমগাছের ঝোপ থেকে পাখী গেয়ে উঠত, মাথার উপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে বাদুড়ের দল উড়ে যেত,—ঝির-ঝিরে হাওয়ায় বনফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসত—আহা, সে যেন কোন্ সোনার দেশের সোনার স্বপন-কথা! আজ কোথায় সেই খেলুড়ির দল,—কোথায় সে খেলার আমোদ—কোথায় সে ছোট ঢেউয়ের তরল মৃদু সুরের গান! আজ এই বাড়ীর চারটে দেওয়ালে তাকে যেন গারদের মতই আটকে রেখে দিয়েছে—প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, চোখ জলে ভরে আসে! ছুটে কোথাও গিয়ে এতটুকু আরাম পাবে, এমন ঠাঁই নেই,—তার ফুরসুৎই বা কোথায়!

২

এমনই ভাবে তিন-চার বছর কেটে গেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হিরণের রঙ আরও ফুটে উঠতে লাগল, কিরণ ততই বিশ্রী হতে চলল। সৎমার মন তখন অস্থির হয়ে উঠল। ভালো কাপড়-চোপড়, গহনা-পত্তরে যতই সে কিরণকে সাজিয়ে দেয়, ততই তাকে কুৎসিত দেখায়! এদিকে একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে থাকলেও হিরণকে যেন প্রতিমাখানির মত দেখায়। পাড়ার মেয়েরা এসে হিরণের মুখ থেকে চোখ আর ফেরাতে পারে না—যাবার সময় হিরণকে আদর করে বলে যায়, "আহা, এমন চাঁদের বর্ণ,—রাজার ঘর আলো কর মা।"

শুনে সৎমার গা রাগে ইষ্‌পিষ্‌ করতে থাকে। মুখে কিছু সে বলতে পারে না। বললে পাড়ার মেয়েরা এখনই এক কথার জায়গায় দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে যাবে। তারা ত হিরণ নয় যে পড়ে পড়ে কথা শুনবে। তারা সৎমার কি ধার ধারে যে চুপ করে কথা শুনে যাবে! কাজেই সৎমার মুখ আর ফোটে না, বুকই শুধু হিংসের জ্বালায় জ্বলতে থাকে!

জ্বলতে জ্বলতে সৎমার একটা ভাবনা হল। হিরণ তার এই ফুটফুটে রঙ নিয়ে বাড়ীতে বসে থাকলে কিরণের ত বিয়ে দেওয়া দায় হবে! হিরণকে চক্ষে দেখলে কিরণকে কে বিয়ে করতে চাইবে! রাজা-মন্ত্রী-সদাগরের দল হিরণকে দেখলে কিরণের পানে আর চেয়েও দেখবে না!

তবে, উপায়? হিরণকে কোন রকমে সরাতে হবে। কি করে সরানো যায়? মেরে ফেলা! বাপরে—পাড়ার লোকে এখনই টের পাবে। তাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়ার কথা ত আর পাড়ার লোকের অজানা নয়—জানতে পেরে এখনই কোটালের কাছে বলে দেবে, আর বুড়ো বয়সে শেষে কি ফাঁসির কাঠে প্রাণটা যাবে! না, এ-ভাবে মেরে ফেলা হবে না! একটা ফন্দী চাই—ফন্দী। কিন্তু কি সে ফন্দী!

৩

ফন্দী আঁচতে আঁচতে বর্ষা গেল, শরৎ গেল, হেমন্ত গিয়ে শীত এল। প্রচণ্ড শীত! কুয়াশায় চারিধার দিবারাত্রি ঢাকা—সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। আর থেকে থেকে

উত্তুরে হাওয়ার দারুণ ঝড় বইছে। সে ঝড়ে পথে বা'র হয়, কার সাধ্য! হাওয়া যেন অসংখ্য তীর ছুড়ছে—সেই তীর মানুষের হাড়ের মধ্যে গিয়ে বিঁধছে। এমন দুরন্ত শীতে কিরণ একদিন বায়না নিলে, "আমার চাঁপাফুল চাই—চাঁপাফুলে আমি শিবপুজো করব—তাহলে রাজপুত্র বর হবে।"

মা তখন হিরণকে ডেকে বললে, "এদিকে আয়, শোন্। ওপাড়ার সন্ন্যাসী ঠাকুর কিরণকে বলেছেন, চাঁপাফুলে শিবপূজা করতে—তাহলে ওব রাজপুত্তুর বর হবে! যা, যেখান থেকে পাস্, চাঁপাফুল নিয়ে আয়! ঐ সাজিটা নে,—নিয়ে যা।"

দুরন্ত শীতে হিরণের গায়ে একটা জামা অবধি নেই। তবু হিরণ কোন দিন মুখ ফুটে একটি কথা বলেনি। চাঁপাফুলের কথা শুনে হিরণ বললে, "এ শীতে চাঁপাফুল কোথায় পাব মা? শীতকালে ত চাঁপা ফোটে না।"

মা মুখ বাঁকিয়ে বললে, "তা আমি জানি না। যেখান থেকে পাস্ নিয়ে আয়, নৈলে খেতে পাবিনে। খেয়ে খেয়ে মেয়ে খালি ধিঙ্গী হচ্ছেন, একটা কাজ করতে বললে আবার ছুতো তোলে!"

সৎমার কথা শুনে হিরণের মুখে হাসি এল। কিন্তু সে হাসি চেপে রেখে সে বললে, "এই শীতে চাঁপাফুল কোথা পাব?"

মা বললে, "কোথায় পাবি, তা আমি জানি না। চাঁপাফুল নিয়ে যদি আসতে পারিস, তবেই বাড়ী ঢুকতে দেব—না হলে যেখানে তোর দু'চোখ যায়, থাক্‌গে যা—বসে বসে খেলেই হয় না শুধু—গেরস্ত ঘরের মেয়ে গরুর মত খাটতে শেখ্। কোন কথা শুনতে চাই না—যা, এখনই ফুলের খোঁজে যা।"

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে হিরণ ফুলের সন্ধানে বেরুল। সে ভাবলে, কোথায় যাই! এ শীতে ফুল কি পাব? আর ফুল না পেলে ত বাড়ী ঢুকতে দেবে না, তার চেয়ে এই সোজা চলি—দেখি, বরাতে কি আছে!

হিরণ সোজা পথে চলল। অফুরন্ত পথ। শীতের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এল। পথে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। চারিধার কুচকুচে অন্ধকারে ভরে গেল। হিরণ তবু চলেছে ত চলেইছে। কত দূর হেঁটে গিয়ে খুব দূরে আকাশের উপর সে একটা নক্ষত্র দেখতে গেলে। একটি নক্ষত্র! তার মনে হল, সমস্ত পৃথিবী সমস্ত আকাশ যেন পরামর্শ করে নিশ্বেস আটকে চুপ করে শুধু ঐ একটি নক্ষত্র চোখ দিয়ে দেখচে হিরণ কি করে,—কোথায় যায়! হিরণ সেই তারাটির পানে চেয়ে বরাবর চলল। থেকে থেকে দমকা হাওয়া বইছে। সে হাওয়ায় কেঁপে সে সারা হয়ে যাচ্ছে, হাড় অবধি ঝনঝন করছে, তবু সে তার গ্রাহ্যই নেই। ঐ তারাটির পানে চেয়েই সে চলেছে। যেতে যেতে সে দেখলে, তারাটি ক্রমে বড় হয়ে উঠছে। ক্রমে বড়, আরও বড়—শেষে আরও চলে সে দেখলে সেটি আকাশের তারা নয়—পাহাড়ের মাথায় সেটি একটা বড় মশাল!

হিরণের মনে একটু আহ্লাদ হল। তবে নিশ্চয় ওখানে কোন লোক আছে। চলে চলে সে পাহাড়ের ধারে এল। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—এমন শীতেও তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে— পাও আর চলে না শরীরের রক্তও যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। তবু যেতে হবে—হিরণ পাহাড়ে উঠল।

উপরে উঠে সে দেখে, পাহাড় বরফে ঢাকা—তবু এ বরফে পা রেখে চলতে কষ্ট হয় না—সেই বরফের উপর একটা জায়গায় প্রকাণ্ড কুণ্ড জ্বেলে তার চারধারে ছ'জন মুনি বসে আছেন। একজনের গলায় মালা, মাথায় তাজ, পাকা দাড়ি। বাকী পাঁচজনের বয়স কিছু কম। মুনিরা হিরণকে দেখে বললেন, "তুমি কে মা?

হিরণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। মুনিদের প্রণাম করে সে বসে পড়ল। তারপর খানিকটা জিরিয়ে বললে, "আপনারা দেবতা, আপনারা সব বলতে পারেন—" বড় মুনিটি উঠে হিরণকে কোলে তুলে নিয়ে সেই আগুনের কুণ্ডের কাছে এসে বসলেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বল মা, তুমি এখানে কেন এসেছ?"

হিরণ বললে, "আমার বোন চাঁপাফুলে শিবপুজো করবে। আমার সৎমা তাই আমাকে চাঁপা ফুল নিয়ে যেতে বলেছে। আমি চাঁপা ফুলের খোঁজে এসেছি।"

বড় মুনি বললেন, "এই শীতে চাঁপাফুল কোথায় পাবে মা? শীতে যে গাছপালা সব বরফ হয়ে গেছে—আরও দু মাস যাক্ তখন চাঁপা ফুটবে।"

হিরণ কেঁদে উঠল। কেঁদে সে বললে, "তাহলে কি হবে? ফুল না নিয়ে গেলে আমায় বাড়ী ঢুকতে দেবে না যে।"

বড় মুনি বললেন, "কেঁদো না মা—চুপ কর। চাঁপা ফুল আমি দিচ্ছি—তুমি বড় লক্ষী মেয়ে—আমি সব বুঝতে পেরেছি। এখনই ফুল পাবে।" এই কথা বলে বড় মুনি একটা শঙ্খ বাজালেন—বাজিয়ে তাঁর আসন ছেড়ে সরে বসলেন। দেখতে দেখতে চারিধার ফরসা হয়ে গেল, কুয়াসা কোথায় সরে পড়ল। ঝড় থেমে দক্ষিণে হাওয়া বইতে সুরু হল। নীল আকাশে চাঁদ হেসে ভেসে এল। বরফ-ঢাকা গাছ-পালায় কচি কচি সবুজ পাতা এক পলকে গজিয়ে উঠল। নানা রঙের ফুল ফুটল। গাছে গাছে কোকিলের সাড়া পড়ে গেল! ফুলের গন্ধে চারিধার ভরে উঠল।

বড় মুনি বললেন, "ঐ দেখ মা, তোমার সামনে চাঁপা গাছ—অনেক ফুল ফুটেছে, ফুল নাও।"

হিরণ ফুল তুলে সাজি ভরে মুনিদের এসে প্রণাম করে দাঁড়াল। বড় মুনি বললেন, "যাও মা, এই চাঁদের আলোয় বাড়ী যাও। আমি দাঁড়িয়ে দেখি। তুমি বাড়ী পৌঁছুলে তবে আমি বসব! আমি কে, জান—? আমার নাম শীত।"

হিরণ মুনিদের প্রণাম করে বাড়ী ফিরে গেল। যখন সে বাড়ী পৌঁচ্ছিল, তখন ভোর হয়েছে। বাড়ী ঢুকে যেমন সে ডেকেছে, "মা—" অমনই আবার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু হল। সূর্য্যি উঠি-উঠি করছিলেন, কুয়াশায় কোথায় তিনি ঢাকা পড়ে গেলেন। গাছপালার কচি সবুজ পাতা কোথায় আবার মিলিয়ে গেল। পাখীর গান থেমে চারিধার নিঝুম হয়ে এল।

৪

কিরণের মা চাঁপাফুল দেখে অবাক হয়ে গেল; কিন্তু হিরণকে ফিরতে দেখে মনটাও খারাপ হল। রাত্রে তাকে ফিরতে না দেখে সে ভেবেছিল, ঝড়ে শীতে কোথায় সে পথে পড়ে মরেছে—আপদ দূর হয়েছে! তা নয়, ভোর হতে না হতে আবার কি না হিরণ এসে হাজির! কোথা থেকে ফুল পেলে—খেতে পেয়েছিল কি না, রাত্রে ঘুমিয়ে ছিল কি না—সে কথা একবারও জিজ্ঞাসা না করে হিরণকে সে ফরমাস করলে, "নাও,—পাড়া বেড়িয়ে ঘরে ফেরবার কথা মনেও যে হল তোমার, এই ঢের। এখন নাও, বসে ঢোলে না, উনোনে আগুন দিয়ে ভাত চাপাও গে।"

হিরণের প্রাণটায় যেন কে মুগুরের ঘা মারলে,—এমনি তার কষ্ট হল। এত কষ্ট করে এত ঘুরে সে চাঁপাফুল আনলে, ভেবেছিল, ফুল দেখে মা আজ একটু বোধ হয় আদর করবে, একটা বোধ হয় মিষ্টি কথা বলবে! তা কোথায় কি! যাই হোক, তার জন্য সে কাঁদতে বসল না—এর চেয়ে ঢের কড়া কথা তার শোনা অভ্যাস আছে—এ ত কি! আস্তে আস্তে উঠে হিরণ রান্নাঘরে গেল।

সেই দিনই বিকেল বেলা কিরণের আবার বায়না হল, "মা, আমি আঁব খাব।"

এই শীতকালে, পৌষমাসে আঁব কোথায় পাওয়া যায়। মেয়ের যত অনাসৃষ্টি আবদার! মা ধমক দিয়ে উঠল। কিরণ বললে, "কেন দিদিকে বল না,—চাঁপা ফুল এনে দিলে, আর আজ দুটো আঁব এনে দিতে পারে না!"

মেয়ের কথায় মার চমক ভাঙ্গল। মা বললে, "ঠিক বলেছিস্ রে!"

হিরণের ডাক পড়ল। হিরণ তখন বাইরের উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। হিরণ এলে সৎমা খিঁচিয়ে বললে, "এখনো ঝাঁট-পাটের কাজ শেষ হল না? ভ্যালা গতর যা হোক! মেয়ে খালি বসে বসে কাঁড়ি গিলবেন, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা! খাবার সময় যার দশ হাত বেরোয়, কাজের সময় সে টুঁটো!"

হিরণ বললে, "আমি ত একটুও বসি নি। বাসন মাজা শেষ হল—অমনি সব ঝাঁট দিচ্ছি।"

সৎমা আবার খিঁচিয়ে উঠল, "আবার চোপা!

কথার উপর কথা। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলো-পানা চক্কোর! এখন নাও—কিরণের জন্যে দুটো আঁব নিয়ে এস দেখি।"

হিরণ বললে "পোষ মাসে আঁব কোথায় পাব, মা?" মা বললে, "সে আমি জানিনে। আমি হুকুম করলুম, তুমি যেখান থেকে পার তামিল কর। আঁব না আনতে পারো ত বাড়ীতেও আর ঢুকো না। শুধু খেলে চলে না, কাজ দেখাতে হয়।"

হিরণের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বেচারী ভেবেছিল, আজ একটু সকাল-সকাল কাজ সেরে ঘুমিয়ে নেবে। একদিন একরাত্রি সমানে হাঁটা হয়েছে—তায় রাতে একদণ্ড ঘুমোতে পায় নি। আবার আঁব আনতে হবে!

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে এখনই আরও দশ কথা শুনতে হবে। কাজেই সে শুকনো মুখে পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথে বেরিয়েই হিরণের সেই মুনির কথা মনে হল। সে ভাবলে, নিশ্চয় তিনি দেবতা—তাঁর কাছে যাই। অকালের ফুল দিয়ে তিনি একবার দায়ে বাঁচিয়েছেন—অকালের ফলও যদি কেউ দিতে পারে ত তিনিই পারবেন। হিরণ তাই পাহাড়ের দিকেই চলল। পথে সেদিনও তেমনি শীত, তেমনি ঝড় ছিল। কিন্তু এ ঝড় এ শীত হিরণের গায়ে এতটুকু আঁচড় দিতে পারলে না। হিরণ ভাবলে, এ কি আশ্চর্য্য!

আজ কিন্তু বেশী দূর যেতে হল না। খানিকটা হেঁটে হিরণের পা ভেরে উঠল। সে একটু জিরুবার জন্য একটা মাঠের ধারে বসে পড়ল। ঘুমে চোখ ভরে এল—সে ভাবলে, এবার একটু ঘুমিয়ে নি!

হিরণ স্বপন দেখলে, সেই কাল রাত্রের বরফের পাহাড়ে সে উঠেছে! আর সেই পাহাড়ের চূড়োয় বসে সেই ছ'জন মুনি। বড় মুনিটি উঠে এসে যেন হিরণের হাত ধরলেন, ডাকলেন, হিরণ—"

হিরণের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে সে চেয়ে দেখে, কোথায় পাহাড়—কোথায় বরফ! মাঠের উপর তার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে সেই বড় মুনি। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুনিকে সে প্রণাম করলে। মুনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন, "আমি সব জানতে পেরেছি মা; তুমি আঁবের খোঁজে যাচ্ছ—। ঐ দেখ, তোমার সামনে আঁব গাছ—থোলো থোলো আঁব ফলে আছে—নাও।"

হিরণ চেয়ে দেখে, সত্যই ত। ঐ যে আঁব গাছ! কোথা থেকে এ গাছ এল! ঘুমোবার আগে এ আঁব গাছ ত সে চক্ষে দেখেনি—এ মাঠে গাছ ত একটিও ছিল না! মুনিকে সে আবার প্রণাম করলে। মুনি বললেন, "এই নাও মা—আমি ডাল নুইয়ে ধরছি, তুমি আম পাড়ো।"

মুনি গাছের ডাল নুইয়ে ধরলেন। হিরণ দুটি আঁব ছিঁড়ে নিলে। মুনি বললেন, "আরো নাও।"

হিরণ বললে, "আর ত আমার দরকার নেই। ওরা দুটি শুধু নিয়ে যেতে বলেছিল।"

মুনি বললেন, "তুমি নিজে খাবে, নাও। আমি বলছি, একটাও নাও।"

হিরণ নিজের জন্য আর একটি আঁব নিলে। আঁব নেওয়া হলে সে চেয়ে দেখে, কোথায় মুনি! কোথায় গাছ! কেউ নেই! সে তখন খুসি-মনে ঘরে চলল।

৫

আঁব দেখে মা অবাক—আঁব খেয়ে মেয়ে বলে উঠল, "ও মা, চমৎকার আঁব, মা, চমৎকার আঁব। আরো দুটো দে।" মা বললে, "আর পাব কোথায়? মোটে ত দুটি এনে দিয়েছে—"

হিরণ বললে, "না, আর একটা আছে—নাও।"

নিজের আঁবটিও হিরণ কিরণকে খেতে দিলে। সেটি খেয়ে শেষ করে কিরণ বললে, "আর একটা দে"—

হিরণ বললে, "আর ত নেই—"

"না, দে,—না দে—"বলে কিরণ মহা আব্দার জুড়ে দিলে।"

হিরণ বললে, "দুটি চেয়েছিলে, আমি তবু তিনটে এনেছিলুম মা।"

হিরণকে ভেঙচে কিরণ বললে, "কোথা থেকে আঁব পেলি, বল্—আমি গাছ মুড়িয়ে নিয়ে আসব।"

হিরণ বললে ; "সেই দূরে যে মাঠ আছে—সেই মাঠে একটি মোটে গাছছিল, এ সেই গাছের আঁব। চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"না, তোকে যেতে হবে না,"—বলে কিরণ হিরণকে একটা ধমক দিয়ে মাকে বললে, "তুই চ' মা—একটা বড় ঝুড়ি নে। ঝুড়ি ভরে আব নিয়ে আসব।"

হিরণ আবার বললে, "আমিও সঙ্গে যাই—যদি তোমরা পথ চিনতে না পারো—"

কিরণ খিঁচিয়ে উঠল "না, তোকে যেতে হবে না—খবরদার! রাক্কুসি, গাছ মুড়িয়ে নিজে সব খাবেন, আর আমার জন্যে আনবেন মোটে তিনটি! তুই যদি সঙ্গে যাস্ ত কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।"

হিরণ ভয়ে চুপ করে রইল। মা ও মেয়ে দুটি ঝুড়ি নিয়ে পথে বার হল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঝড়ের বেগও বেড়ে উঠেছে। সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে.—সে যেন ভূতের নিশ্বাসের মতই ভয়ঙ্কর! কড়কড় করে মেঘ ডাক্‌তে লাগল। ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে হিরণ চুপ করে পড়ে রইল। তার পর কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল, তা সে জানতেও পারলে না।

যখন হিরণের ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে চেয়ে দেখে, দোর জানলার ফাটল দিয়ে জরির তারের মত চিক্‌চিকে দিনের আলো ঘরে ঢুক্‌ছে। তাড়াতাড়ি উঠে সে বাইরে এল, ডাকলে, "মা—" কেউ সাড়া দিলে না। সে তখন ডাকলে, "কিরণ—" কিন্তু কোথায় কে! কারও সাড়া নেই!

হিরণের ভাবনা হল,—কোথায় কিরণ! কোথায় মা! এত বেলা হল, এখনও কারও দেখা নেই কেন? সে পথে বেরিয়ে পড়ল।

খানিক দূরে গিয়ে সে দেখে, একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝড়ে পড়ে গিয়েছে, আর সেই গাছের তলায় চাপা পড়ে কি ও? হিরণ এগিয়ে গিয়ে দেখে, তার সৎমা আর কিরণ। গাছ চাপা পড়ে মরে গেছে। হাতের ঝুড়ি কোথায় ঠিকরে খানায় পড়ে আছে! ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। সে পড়ে যাচ্ছিল—এমন সময় কে তরে হাত ধরে ফেললে। হিরণ দেখে, সেই বড় মুনি। মুনি বললেন, "ভয় কি মা! —ওরা হিংসুকে ছিল, দুষ্ট ছিল, তাই ওদের এ দুর্গতি। তুমি আমার সঙ্গে এস, গোলাপপুরের রাজপুত্রের বিয়ের জন্যে কনে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দেব। তুমি বড় লক্ষ্মী মা—তুমি রাজরাণী হবে।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ন্যায় বিচার।

আপনার সুবিধা খোঁজা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; এবং যদি পরের অনিষ্ট না করিয়া নিজের সুবিধা, নিজের স্বার্থ-সাধন করা যায় তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু যদি আপনার স্বার্থ-সাধন করিতে গিয়া অন্যের ক্ষতি হয় তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। স্বার্থের দ্বারা বিচার করিলে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথম যাহারা আপনার স্বার্থ-সাধন করে; পরের অনিষ্ট ত করে না, পরের জন্য নিজের স্বার্থ ছাড়েওনা। ইহারা জগতের সাধারণ লোক। দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা আপনার স্বার্থ-হানি করিয়াও পরের উপকার করেন; ইঁহারা জগতের নিঃস্বার্থ মহৎ লোক। তৃতীয়তঃ যাহারা যে কোনও প্রকারে আপনার স্বার্থ সাধন করিতেই ব্যগ্র; তাহাতে পরের যাহা ক্ষতি হয় হউক, সে বিষয়ে গ্রাহ্য নাই। ইহারা পৃথিবীর স্বার্থপর লোক। স্বার্থপর লোকের লাঞ্ছনা ও শাস্তি সম্বন্ধে দুইটী গল্প তোমাদিগকে বলিতেছি।

প্রথম—নিউজিলাণ্ডের এক ধনীর বাড়ীতে তাঁহার পুত্রের বিবাহ ছিল। তিনি বেশ সৌখীন, উদারহৃদয় লোক। ছোট বড় সকলেরই সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করিতেন। একমাত্র পুত্রের বিবাহ সময়ে তিনি মনে করিলেন যে, আপনার পরিচিত ছোট বড় সকল শ্রেণীর

লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়া অত্যন্ত ধুমধামের সহিত পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করাইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া দেশ বিদেশে বন্ধু বান্ধব, ছোট বড়, সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বিবাহের তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের আহারাদির জোগাড় করিতে লাগিলেন। খাদ্যাদির যথেষ্ট আয়োজন হইল। বিবাহের পূর্ব্ব দিন সারা দিন রাত্রি ঝড় হওয়াতে, সেদিন মাছ পাওয়া গেলনা। সকালবেলা হইতে নিমন্ত্রিতগণের জন্য রান্না হইতে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু মাছ না পাওয়াতে সেই ধনী গৃহস্থ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

বেলা হইয়া উঠিল, খাবার সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আসিল, এমন সময়ে তাঁহার একজন কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাহিরে এক ধীবর বড় বড় মাছ লইয়া বিক্রয় করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধীবরকে মাছ লইয়া বাড়ীর ভিতর আসিতে হুকুম দিলেন।

ধীবর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি মাছ দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন "আহা! তুমি উপযুক্ত সময়ে এসেছ! আজ এই আনন্দের দিন মাছের অভাবে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছিল। তুমি বিবেচনা করে' দামটা বলে' দেও। তুমি যে দাম ব'লবে, আমি তাই দিতে রাজী আছি"। তখন সেই ধীবর জোড়হাতে বলিল "হুজুর, আমি এই সমস্ত মাছগুলির মূল্যবাবদ একশত বেত্রাঘাত চাই। তাহাই আমার সমস্ত মাছের মূল্য"। ধীবরের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই অবাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া ধীবর বলিল "আপনারা অবাক্ হবেন না। আমি 'অনেক বিবেচনা করে' মাছের এই দাম ঠিক ক'রেছি। আমাকে পাগল মনে ক'রবেন না। দয়া করে' আমাকে দাম দিয়ে মাছগুলি নিয়ে যান"।

সেই ভদ্রলোকের মাছের একান্ত দরকার ছিল। মাছ লইতেই হইবে। এদিকে ধীবর ঐরূপ কথা বলিতেছে শুনিয়া তিনি তাহাকে অনেকবার বুঝাইলেন। কিন্তু সে বুঝিবার লোক নয়। সে তখনও পূর্ব্বের ন্যায় একশত বেত্রাঘাতের জন্য জিদ করিতে লাগিল। ধীবরকে জিদ করিতে দেখিয়া তাহাকে ঐ মূল্য প্রদান করাই ঠিক হইল। গৃহস্থ মাছগুলি অন্দরে পাঠাইয়া দিয়া, কেবলমাত্র ধীবরের জিদ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে নিজে একগাছা বেত লইয়া তাহার হাতে মারিতে লাগিলেন। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া পঞ্চাশ বার মারিবা মাত্র ধীবর বলিয়া উঠিল "হুজুর, থামুন। আমার এই কারবারে একজন অংশী আছে। এই মাছের অর্দ্ধেক দাম তার প্রাপ্য। সে বাহিরে আছে। বাকি দামটা তাহাকে দিতে হইবে।"

তখন সে ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন "বাঃ! তোমার মত পাগল আরো আছে নাকি? আচ্ছা, বেশ, সে কোথায় আছে বল। আমি এখনই তাকে এনে বাকি দাম দিচ্ছি।" ধীবর বলিল "হুজুর, আমার অংশী আর কেউ নয়। সে আপনার দরওয়ান।" তারপর গৃহস্থ দরওয়ানকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া ধীবরের সম্মুখে আনিলেন। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ধীবরকে আমূল সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে বলিলেন। ধীবর বলিল "হুজুর, এই লোকটা ভয়ানক স্বার্থপর। আমি গরিব লোক—মাছ ধরিয়া জীবন বাঁচাই। আজ আপনার বাড়ীতে ধুমধামের নিমন্ত্রণ আছে জেনে অতি কষ্টে এই কয়েকটা মাছ জোগাড় করে, দুপয়সা লাভ করবার আশায় এসেছিলাম। কিন্তু এই দরওয়ানটা আমায় কোনো মতে এখানে মাছ বেচিতে দিতে রাজী ছিল না। পরে এই মাছের দামের অর্দ্ধেক তাকে দিবার বন্দোবস্ত ক'রলে তবে সে রাজী হ'য়ে আপনাকে খবর দিয়েছে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে আমার মাছের দামের অর্দ্ধেক তার পাওনা।"

ধীবরের নিকট এই কথা শুনিয়া গৃহস্থ সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্বার্থপর অসৎ দরওয়ানকে অতি জোরে পঞ্চাশ বেত মারিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এবং ধীবরকে মাছের দাম এবং তাহার নির্ভীকতার পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।—

দ্বিতীয়—বোগদাদের কোনো সহরে, আলিশাকল নামে একজন নাপিত ছিল। সেই সহরে ক্ষৌর কার্য্যের জন্য তাহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। অনেক দূরদেশ হইতে লোকেরা তাহার নিকট ক্ষৌর কার্য্যের জন্য আসিত। ক্রমে ক্রমে সে বেশ পসার করিয়া লইল। অবস্থা যখন ভাল হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার অর্থ লালসা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে; সে কথায় কথায় লোককে ঠকাইয়া পসো উপার্জ্জন করিবার নূতন নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সরল প্রকৃতির লোক তাহার নিকট আসিলে সে তাহাকে কথার ফেরে ফেলিয়া তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত।

একদিন এক কাষ্ঠ বিক্রেতা গাধার পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া তাহার নিকট বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত হইল। আলিশাকল তাহাকে দেখিয়াই ঠকাইবার বুদ্ধি আবিষ্কার করিয়া লইল। দর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, গাধার পৃষ্ঠে যত কাঠ রহিয়াছে তাহার মোট দাম হইবে এক টাকা। দাম স্থির করিয়া কাষ্ঠ বিক্রেতা গাধার পৃষ্ঠ হইতে সমস্ত বোঝা নামাইয়া দিয়া আলিশাকলের নিকট দাম চাহিল। তখন আলিশাকল বলিল "তুমিতো এখনও সব কাঠ নামাও নাই। সবটা নামাইয়া দাও তবে দাম দিব।" সে ব্যক্তি অবাক হইয়া বলিল "কেন আমি সব দিয়েছি। দেখুন না, গাধার পিঠে আর কাঠ নাই।" তখন আলিশাকল গাধার পৃষ্ঠের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বসিবার আসন দেখাইয়া বলিল "সে কি, তোমার গাধার পীঠের সমস্ত কাঠের দাম ঠিক হ'য়েছে এক টাকা। ঐ যে আসন খানা র'য়েছে, ওটাও তো কাঠ। ও আসনটাও ঐ দামের মধ্যে দিতে হবে।" তখন সে ব্যক্তি অপ্রস্তুত। কিন্তু আলিশাকল ছাড়িবার লোক নহে। সে জোর করিয়া সেই আসন খানা লইয়া তাহাকে এক টাকা বিদায় দিল।

কাষ্ঠ বিক্রেতা সেই নগরের বড় বড় কয়েক জন লোকের নিকট এই অপকারের সংশোধন করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। তাহাদের উপর আলিশাকলের এমন প্রভুত্ব ছিল যে, কেহ তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহসী হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে বেচারা ঐ নগরের কাজিসাহেবের নিকট নালিশ করিল। কাজিসাহেব তাহার নালিশ শুনিয়া বলিলেন "তুমি তার কথার ফাঁদে পড়েছ। তোমাদের চুক্তির হিসাবে সে ঠিক কাজ করেছে বটে, তবে ন্যায়ের বিচারে তার অন্যায় করা হয়েছে।" এই কথা বলিয়া তিনি কাষ্ঠ বিক্রেতার কাণে কাণে কি একটা কথা বলিয়া দিলেন। তাহাতে সে খুসী হইয়া চলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে ঐ ব্যক্তি আলি শাকলের ঘরের বাহিরে গাধাটা বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া বলিল "ভাই! আজ অনেক দিন পরে তোমার কাছে এসেছি। আমার একটী সঙ্গী আছে। *আমাদের দুজনের চুল কেটে দিতে হবে। তোমাকে* আট আনা দিব। আগে আমার চুল কাটা হলে' আমার সঙ্গী ভিতরে আসবে তখন তার চুল কেটে দিও।" এই কথায় সম্মত হইয়া আলি শাকল তাহার চুল কাটিয়া দিল। তখন সে ব্যক্তি বাহির হইতে তাহার গাধাটীকে আনিয়া বলিল "এইবার আমার সঙ্গীর চুল কাট। আলি শাকল অবাক। সে বলিল "সে কি কথা! আমি গাধার চুল ছাটবো কি ক'রে। তা হ'লে যে আমার জাত-ভাইরা আমায় এক ঘ'রে করবে, তখন উভয়ে ঝগড়া বাধিয়া গেল।

কাষ্ঠ বিক্রেতা কাজির নিকট গিয়া নালিশ করিল। তিনি আলি শাকলকে শমন দিয়া ডাকাইলেন। সে কাজির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "হুজুর, এই ব্যক্তির সঙ্গীর চুল কাটবার জন্য চুক্তি হইয়াছিল বটে। কিন্তু গাধার চুল কাটবার কথা হয় নি।' কাজি বলিলেন "কেন গাধা কি সঙ্গী হ'তে পারে না?" আলিশাকল বলিল "আমি আগে চুক্তি ক'রবার সময় এতটা বুঝতে পারিনি।" তখন কাজি বলিলেন "গাধার পিঠের কাঠ বিক্রীর সময় এ ব্যক্তি কি বুঝেছিল যে, গাধার পিঠের আসন খানাও সেই কাঠের সঙ্গে দিতে হবে? তা হবে না। তোমায় চুক্তিমত গাধার চুল ছাটতেই হবে। নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।" কাজির ভয়ে আলিশাকল

সেই সভার মধ্যে উপস্থিত সকলের সম্মুখে গাধার চুল ছাটিয়া দিল।

এই কথা অচিরাৎ দেশমধ্যে বাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গাধার চুল কাটার অপরাধে আলিশাকলের স্বজাতীয় নাপিতগণ তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া দিল। এইরূপে সেই অসৎ আলিশাকল স্বার্থপরতার শাস্তি পাইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কাল কাটাইতে লাগিল।—

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস

তিন কামনা।

এক জোলা আর তার জোলানী ছিল। তারা ভারী গরিব। জোলা নিত্য ভিক্ষা করে, তাতেই দুজনের পেট চলে। কিন্তু জোলানীর মন পাওয়া ভার! তার উপর যে দিন ভিক্ষার ঝুলি উনো পড়ে, সে দিন জোলার ভিটেয় টেকা দায়।

কপাল-দোষে একদিন জোলার মোটেই ভিক্ষা জুট্‌লো না। সারাদিন ঘুরে' ঘুরে' সন্ধ্যা-বেলা শূন্য হাতে ঘরে ফির্‌তে পা উঠ্‌চেনা, বেচারা নিবিড় বনের ধারে ব'সে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। হঠাৎ এ কি?—জোলা চেয়ে দেখে তার সাম্‌নে আঙ্গুলটীর মত ছোট্ট একটী পরী।

পরীটী বল্‌লো—"বাছা, তুমি কাঁদ কেন?"

জোলা বল্‌লে—"আমি বড় দুঃখী। নিত্য ভিক্ষা ক'রে খাই, আজ সে ভিক্ষাও মিল্‌লো না। কি নিয়ে এখন ঘরে ফিরি!—তাই মনের দুঃখে কাঁদ্‌চি।"

পরীটী বল্‌লো—"কেঁদোনা, বাছা। আমি বর দিচ্ছি—তুমি একবার দুবার তিনবার যা কামনা করবে, সব ফল্‌বে।'

জোলা শুনে' অবাক! তার কামনা ফল্‌বে! খাবার-দাবার ধনদৌলত যা-খুসি তবে পাওয়া যাবে! মনের আনন্দে জোলা জোলানীকে খোস-খবর দিতে ছুটলো।

সকল শুনে, জোলানী বল্‌লে, "ছাঃ! এ আবার একটা কথা! হতচ্ছাড়া মিন্সে ভিক্ষের চাল কোথা খুইয়ে চোক-ঠার দিতে এলো!"

জোলা দিব্যি গেলে যতই বোঝায়, জোলানী ততই বলে—"ও সব মিছে।" শেষে হঠাৎ জোলানীর মাথায় এক বুদ্ধি খেল্‌লো। সে বল্‌লে—'ভাল, তোর কথা সত্যি কিনা, এখনই পরখ হোক্! আমরা তো আর রাজভোগ কখনো খাইনি, আনা দেখি তেম্‌নি খাবার?"

জোলা 'আচ্ছা' ব'লে যেমন রাজভোগের কথা মনে ভাব্‌চে, অম্‌নি ঝুরি ঝুরি লুচি, হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, মেঠাই-মোণ্ডা, কোর্ম্মা-পোলাও তাদের কুঁড়ের মধ্যে পড়্‌তে লাগ্‌লো! জোলা জোলানী সে সব খাবার জন্মেও চোকে দেখেনি, খেয়ে ফুরাবে সাধ্য কি?

খেতে খেতে জোলা জোলানী দুজনেরই হঠাৎ মনে হ'ল,—হায় হায়, একটা কামনা মিছামিছি কেন নষ্ট কল্লুম! এর চেয়ে ধনদৌলত টাকাকড়ি চাইলে খাবার টাবার যে তা হ'তেই সব মিল্‌তো।

কিন্তু দোষ কার্? জোলা বলে—"জোলানী কেন পরখের কথা তুললি?" জোলানী বলে—"সত্যি ফল্‌বে জেনে শুনেও মিন্সে কেন অম্‌নি পরখ কর্‌লি?"

এই-না ব'লে দুজনে তুমুল ঝগড়া।

রাগের মাথায় শেষে জোলা হঠাৎ বলে ফেল্‌লে—"দূত্তুর তোর খাবার! অমন খাবার তোর মাথায় থাক্, আমি চল্লুম।"

যাই না এরূপ বলা, অম্‌নি লুচি পুরি মেঠাই মোণ্ডা ভাঁড়ে ভাঁড়ে জোলানীর মাথায় চেপে বস্‌ল। হাঁড়ির উপর হাঁড়ি, ঝুরির পাশে ঝুরি—একশো রকম খাবারের চাপে জোলানীর ওষ্ঠাগত প্রাণ! কত টানাটানি ঠেলাঠেলি, তা নড়াবে কার সাধ্য?

জোলানী অবশেষে জোলার পায়ে কেঁদে পড়্‌ল, "তুমি আমার স্বামী। তোমায় গাল দেওয়ার এই ফল। আমায় মাপ কর,—তোমার বাকী কামনাটী দিয়ে আমার মাথার হাঁড়ি খসিয়ে দেও।"

জোলা তখন আর এক কামনা ক'রে জোলানীর মাথার ভাঁড় ছাড়িয়ে দিলে।

জোলার তিন কামনা ফুরিয়ে গেল। রাজ্য ধন টাকা কড়ি কিছুই জোলার হ'ল না, বটে; কিন্তু যে মনের শান্তি রাজার মাণিকের চেয়েও বড়, এবার হ'তে স্বামী-স্ত্রী সে মাণিকের মালিক হ'ল।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

আকাশ-ঋষি

আকাশ, তব সুনীল কোলে, নিত্য হাসে রবি-শশী ;
বিশ্বময়ের গান গেয়ে যায়, নিত্য তোমার কোলে বসি।
তোমার কোলে উদয় তাদের, অস্ত পুন তোমার কোলে ;
এমনি ক'রে নিত্য তারা, আসে পুন যায় গো চ'লে।

নিত্য কত মোহন সাজে, সাজায় তোমায় সন্ধ্যা-উষা ;
চন্দ্র আসি তোমার কোলে, মিটায় চকোর পাখীর তৃষা।
নিত্য সিন্ধু-শীকর তোমার, বক্ষে গিয়ে করে খেলা,
ক্ষণ পরে আবার তারা, প্রতিভাতে মেঘমালা।

উদার চেতা, মহানুভব, আকাশ তুমি মহান্ ঋষি ;
অচল অটল ভাবে তুমি, ধ্যানে মগ্ন দিবানিশি।
বিশ্বব্যাপী শরীর তব ধারা তব দীর্ঘ জটা ;
ইন্দ্রধনু উপবীত, সুনীল ভাতি দেহের ছটা।

জ্যোৎস্না তব শান্তিবারি, বজ্র তব তেজোরাশি ;
সৌদামিনী দেখায়ে যায়, তোমার উদার মোহন হাসি।
তোমার অতি উদার স্বভাব, বিশ্ব তোমার আশিস মাগে ;
সন্ধ্যা-প্রাতে পাখীরা সব, তোমায় দেখে ঘুমোয় জাগে।

অভ্ররূপী শুভ্র বাকল, নিত্য তুমি ধারণ কর ;
তারায় গেঁথে তারার মালা, নিত্য তুমি গলায় পর।
উল্কা তোমার হোমের শিখা, অজিন তোমার কৃষ্ণজলদ ;
আকাশ তুমি মহান্ যোগী, আশিস তব যাচে জগৎ।

শ্রীবলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ধাঁধার উত্তর

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল,.

১।৮ ২। আশীবিষ

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন, শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র, শ্রীবনবিহারী পোদ্দার, শ্রীমতী রেণুকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ ঘটক, শ্রীনীরজনাথ ঘটক, শ্রীসরোজনাথ ঘটক, A Padhan Esqr, শ্রীরজনীকান্ত মুন্সী, সম্পাদক, ছাত্র-সভা, কলমা, শ্রীহরিপদ ঘোষ, কুমারী প্রফুল্লমুখী চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ি, M. N. Abul Hasnat Esqr. শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন কুণ্ড ও শ্রীউপেন্দ্রমোহন কুণ্ড।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন, শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীসকলদীপ প্রসাদ সিংহ, কুমারী প্রীতিবিন্দু চৌধুরী, শ্রীইন্দ্রভূষণ বীর, শ্রীললিতকুমার দে, শ্রীতুষাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুনারায়ণ মুন্সী, শ্রীহিমাংশুভূষণ মজুমদার, শ্রীমতী অমিয়বিন্দু গুপ্ত, শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীঅমূল্যকুমার দাস, শ্রীমতীপুষ্পমালা-চন্দ্র, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অমিয়বালা দেবী, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুধেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা

১। দুটী হাত, চারি পা, নাই লেজ মুড়ো,
সকলেরে কোলে করে কিবা ছেলে বুড়ো।

২। ডানা নাই উড়ে যায়, মুখ নাই ডাকে,
বুক ফুটে আলো ছুটে, কাণ ফাটে হাঁকে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
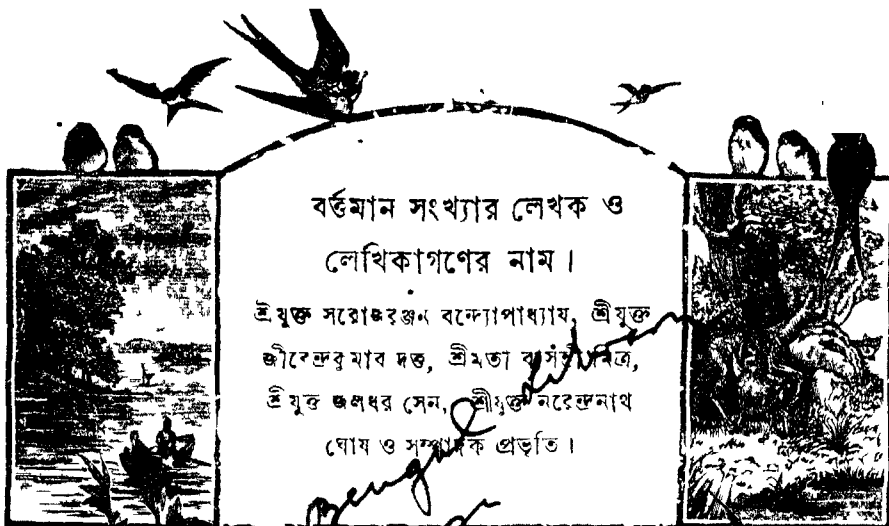
বর্ত্তমান সংখ্যার লেখক ও
লেখিকাগণের নাম।
শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীমতী বা… মিত্র,
শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ
ঘোষ ও সম্পাদক প্রভৃতি।
মুকুল
২০শ খণ্ড] [৩য় সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩২১।
বালকবালিকাদিগের উপযোগী
সচিত্র মাসিক পত্র।
নীতি বিদ্যালয় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
ডাকমাশুল সহ ১।৹ টাকা।
মুকুল কার্য্যালয়,
২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট,—কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা ৵০
ডাকমাশুল ৴০

মুকুল

২০শ বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩২১। | ৩য় সংখ্যা।

কবি ও কাব্যের কথা।

রবার্ট ব্রাউনিং।

মুকুলের পাঠক পাঠিকাদিগকে আমরা বাঙ্গলার কবি ও কাব্যের কথা বলিয়াছি। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবিদিগের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়া দিয়াছি। ক্রমে জগতের সকল শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়, এই আমাদের ইচ্ছা। আমরা আশা করি, ক্রমে ক্রমে সকল দেশের কবি ও কাব্যের কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিব। বাঙ্গলা সাহিত্যের পরে ইংরাজী সাহিত্য আরম্ভ করিতেছি। ইংরাজী সাহিত্য অতি বিস্তৃত; আমরা একে একে শ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবি ও তাঁহাদের কবিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমাদিগকে দিব। আজ তোমাদিগকে ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং এর কথা বলিতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে ইংলণ্ডে দুই জন শ্রেষ্ঠ অঙ্গের সমসাময়িক কবি ছিলেন। আলফ্রেড টেনিসন ও রবার্ট ব্রাউনিং। উভয়ের বয়স প্রায় এক ছিল। ১৮০৯ সালে টেনিসনের জন্ম হয়, ১৮১২ সালে ব্রাউনিংএর জন্ম। উভয়ে একই সময়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; উভয়ের প্রতিভায় সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই কবিযুগল উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে অমূল্য রত্ন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। নীচপ্রবৃত্তিসুলভ ঈর্ষা তাঁহাদের উদার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। প্রথম হইতেই টেনিসনের কবিতা জনসাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল; কিন্তু ব্রাউনিং বহুদিন পর্য্যন্ত সাধারণের আদর পান নাই, কেবল অল্পসংখ্যক চিন্তাশীল লোক তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন; ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু এখনও যে ব্রাউনিং জনসাধারণের কবি হইয়াছেন এমন বলিতে পারা যায় না; তবে এক দল লোক আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি মনে করেন।

ব্রাউনিংএর কবিতায় এমন কতকগুলি দোষ ও গুণ আছে, যাহার জন্য তিনি কোনদিন সাধারণের কবি হইতে পারিবেন না। তাঁহার চিন্তা অতি গভীর; সেই জন্য ভাষা ও অনেক পরিমাণে জটিল। ব্রাউনিংএর কবিতা পাঠ উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণের ন্যায় শ্রমসাধ্য। কিন্তু গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারিলে যেমন তাহার চারিদিকের বহু দূর বিস্তৃত দৃশ্য এবং প্রাণপ্রদ বায়ু উপভোগ করিতে পারিয়া মন পুলকিত হয়, ব্রাউনিংএর কবিতাপাঠে মনে সেইরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে। আমরা আশা করি, সময়ক্রমে তোমাদের মধ্যে অনেকে ব্রাউনিংএর কবিতা পাঠ করিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করিবে। সেই আশা ও উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে ব্রাউনিংএর কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রথমে সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বলিতেছি।

ক্যাম্বারওয়েল নামক লণ্ডনের এক অংশে ১৮১২ সালের ৭ই মে রবার্ট ব্রাউনিংএর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের কেরাণী ছিলেন; তাঁহার বার্ষিক আয় কখনও ২৭৫ পাউণ্ডের অধিক ছিল না; সেই

জন্যই বোধ হয়, তিনি ব্রাউনিংকে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশ্রেণীর স্কুলে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদর্শী লোক ছিলেন; অল্প বয়সেই তিনি পুত্রের ভাবী প্রতিভার আভাস পাইয়াছিলেন এবং তাহার বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিলেন। নিজে দরিদ্র হইলেও পুত্রকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোনও চিন্তা করিতে দেন নাই, তাঁহার ইচ্ছামত নিরুদ্বেগে সাহিত্যচর্চ্চার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ব্রাউনিংএর স্কুলের পাঠ শেষ হয়; কিন্তু তৎপরে তিনি গৃহে পিতা এবং শিক্ষকের নিকটে গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। ব্রাউনিংএর পিতা অতিশয় অধ্যয়নশীল লোক ছিলেন; তাঁহার নিজের পুস্তকালয়ে প্রায় ছয় হাজার পুস্তক ছিল। ব্রাউনিং এই জন্য অল্পবয়স হইতে যথেচ্ছ অধ্যয়নের সুবিধা পাইয়া ছিলেন। তিনি দিবারাত্রি পড়িতেন; অল্প বয়সে তিনি ইংরাজ কবি বাইরণের খুব ভক্ত ছিলেন। বাইরণের মৃত্যুর বৎসরে ব্রাউনিং, বার বৎসরের বালক, তখনই তিনি বাইরন সম্বন্ধীয় কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা সংগ্রহ করিয়া তাহা ছাপাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ব্রাউনিং শেলি ও কীটসের ভক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রভাব ব্রাউনিংএর কবিতার উপরে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

বাল্যকাল হইতে ব্রাউনিং জীব জন্তু পালন করিতে ভাল বাসিতেন এবং মনোযোগের সহিত তাহাদের প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেন। ব্রাউনিংএর কবিতায় ইতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ও তাহাদের স্বভাব পর্য্যবেক্ষণের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি বাড়ীতে পেঁচা, বাঁদর, সজারু, ঈগল প্রভৃতি পুষিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার একটা পোষা কোলা ব্যাং ছিল; ব্রাউনিং ডাকিলে সেটী গর্ত্তের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিত এবং তাঁহাকে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে দিত।

ব্রাউনিং যদিও অল্প বয়সে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন, তথাপি তিনি গৃহে নিয়মিত শিক্ষাধীন ছিলেন। অপরাহ্নকাল সঙ্গীত চর্চ্চা, ব্যায়াম প্রভৃতিতে অতিবাহিত করিতেন। তিনি বেশ পিয়ানো বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার কবিতায় কলাবিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ব্রাউনিং সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম রচনা ১৮৩৩ সালে তাহার বাইশ বৎসর বয়সে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমে গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ব্রাউনিং গ্রন্থ খানি গোপনে লিখিয়া গোপনেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হাতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড পড়ে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া এডিনবরা ম্যাগাজিন নামক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় *ইহার সমালোচনা লিখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া* ছিলেন, কিন্তু সম্পাদক সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। এথিনিয়াম নামক বিখ্যাত সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকাতে ইহার প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। ব্রাউনিংএর এক নিকট আত্মীয় ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের নাম পলিন। ব্রাউনিং পলিনের রচনায় তৃপ্ত হন নাই, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ করেন নাই; পরে ১৮৬৭ সালে ইহার পুনর্ম্মুদ্রণের অনুমতি দিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সালের শেষ ভাগে ব্রাউনিং একবার রুশিয়া গমনের সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং তিন মাস সেখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রুশিয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি মন্থলী রিপজিটরী নামক সাময়িক পত্রিকাতে কতক গুলি কবিতা প্রকাশ করেন। এখন হইতেই ব্রাউনিংএর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হয়। ১৮৩৪-৩৫ সালে তিনি প্যারাসেলসাস (Paracelsus) নামক সুবিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন। এই সময়ে ম্যাকরিডী নামক একজন নাট্যকারের সহিত ব্রাউনিংএর পরিচয় জন্মে এবং তাঁহার প্ররোচনায় ব্রাউনিং নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪০ সালে ব্রাউনিংএর সুবৃহৎ গ্রন্থ সর্ডেলো প্রকাশিত হয়; অনেকে ইহাকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। অনেক বৎসর অবধি তিনি ইহার রচনাতে

নিযুক্ত ছিলেন। এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয়ের ঘটনা স্থল ইটালী। ঘটনাস্থলে বসিয়া বর্ণিত বিষয় লিখিবার উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ব্রাউনিং ইটালী যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তিনি ট্রীষ্ট, ভিনিস, এসেলো এবং তৎপরে জর্ম্মানীর মিউনিক, ফ্রাঙ্কফোর্ট, মেঞ্জ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া গ্রীষ্মকালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ব্রাউনিংএর অধিকাংশ কবিতার ঘটনা স্থল ইটালী। এই বিষয়ে টেনিসনের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য দেখা যায়। টেনিসনের অধিকাংশ কবিতার ঘটনা স্থল ইংলণ্ড, তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে আপনার কবিতার বর্ণিত বিষয়ে গ্রহণ করিতেন, ইংলণ্ডের দৃশ্য বর্ণনায় তাঁহার কবিতা পরিপূর্ণ। ব্রাউনিংএর কবিতায় তাহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। ব্রাউনিংএর অধিকাংশ কবিতার গল্প ও ঘটনাস্থল ইংলণ্ডের বাহির হইতে গৃহীত। মধ্য বয়সে ব্রাউনিং ইটালীতেই বাসস্থান করিয়াছিলেন। যে কারণে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইটালীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাউনিংএর হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচায়ক। ব্রাউনিং ও টেনিসনের কবি প্রতিভায় যে সময়ে ইংলণ্ডের সাহিত্য আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে ইংলণ্ডে এলিজাবেথ ব্যারেট নাম্নী এক মহিলা কবির অভ্যুদয় হইতেছিল। ইনি বয়সে ব্রাউনিং অপেক্ষা ছয় বৎসরের বড় ছিলেন। ব্রাউনিং তাঁহার কবিতা পড়িয়া প্রীত হইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে চিঠি পত্রে তাঁহাদের পরিচয় হয়। মিস ব্যারেট চিররুগ্না ছিলেন, গৃহ হইতে বাহির হইতেন না। এমন কি অনেক বৎসর শয্যাগৃহেরও বাহির হন নাই। ব্রাউনিং শয্যাগৃহেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। কিছু দিন পরে ব্রাউনিং কুমারী ব্যারেটের পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু কুমারী ব্যারেট আপনার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন, তিনি বলিলেন "আমি বিবাহিত জীবনের সকল কর্ত্তব্য পালনেই অসমর্থ; আমি কেবল আপনার ভার স্বরূপ হইব। সুতরাং আপনার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম।" ব্রাউনিং কুমারী ব্যারেটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোনও কথাই বলিলেন না; কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহার নিষ্কাম অনুরাগ যেমন তেমনি রহিল, তাহাতে কোনও স্বার্থের গন্ধ বা সুখের লালসা ছিল না। যাঁহাকে ভাল বাসেন, তাহার সেবা করিয়াই তিনি কৃতার্থ হইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বের মত কুমারী ব্যারেটের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। অনেক দিন পরে কুমারী ব্যারেট ব্রাউনিংএর ভালবাসার গভীরতা ও নিঃস্বার্থতা দেখিয়া বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, যে আগামী শীত ঋতুতে তাঁহার পীড়া যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে তিনি বিবাহ করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সে বার শীতকালে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অন্য বৎসর অপেক্ষা রোগের যন্ত্রণা কম হইল। ডাক্তারেরা বলিলেন যে তাঁহার ইটালী যাওয়া আবশ্যক, ব্রাউনিং ১৮৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর কুমারী ব্যারেটকে বিবাহ করিয়া ইটালী গেলেন। এই সময় হইতে পত্নীর মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহারা ইটালীতে বাস করিতেন। ইটালীর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে এবং স্বামীর যত্নে মিসেস ব্রাউনিং এর স্বাস্থ্যের বহু উন্নতি হইল। ইটালীর সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা এবং প্রাচীন শিল্প গৌরবের মধ্যে কবিদম্পতি পনর বৎসর পরম সুখে যাপন করিলেন। উভয়ের সংস্পর্শে উভয়ের প্রতিভার পূর্ণতর বিকাশ হইল। এই দুই কবির মিলন সাহিত্য ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব চিত্র। ব্রাউনিং সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পত্নী সুখসচ্ছন্দতা বিধান করিতেন। ১৮৬১ সালের ২৯ জুন ইটালীতে মিসেস ব্রাউনিংএর মৃত্যু হয়। ব্রাউনিং ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে বহু বৎসর আর তিনি ইটালী যান নাই। প্রতি বৎসর ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলা পথিকেরা দেখিতে পাইত, যে এক জন পলিতকেশ প্রৌঢ় লণ্ডনের এক ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে জানু পাতিয়া নত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছেন। নিকটে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইত, তিনি কবি ব্রাউনিং। এই দিনে এই গির্জ্জায় এলিজাবেথ

ব্যারেটের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পত্নী বিয়োগের পর ব্রাউনিং অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৮৮৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর রবার্ট ব্রাউনিংএর মৃত্যু হয়। ইটালীর ফ্লরেন্স নগরে পত্নীর সমাধিপার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার কল্পনা ছিল, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের অনুরোধে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে কবিদিগের সমাধিক্ষেত্রে ব্রাউনিংএর দেহ রক্ষিত হইয়াছে।

ব্রাউনিংএর প্রধান কয়েকখানি পুস্তকের নাম করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ রচনা আছে। বৃহৎ রচনার মধ্যে Ring and the Book নামক পুস্তক বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ব্রাউনিংর রচনার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গীতি কবিতাগুলি অতিশয় উপাদেয়। ব্রাউনিং প্রধানতঃ মানব হৃদয়ের কবি। মানব হৃদয়ের জটিল গভীর ভাবগুলি বিশ্লেষণে তিনি অদ্বিতীয়। মানব চরিত্রের সকল প্রকার জটিলতা, নীচতা, দুর্ব্বলতার সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন; কিন্তু সকল মলিনতা দেখিয়াও তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস তিলমাত্র ম্লান হয় নাই। সংসারের সকল অত্যাচার, অবিচার, পাপ ও মলিনতার মধ্যেও তিনি পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলিয়াছেন,

ভগবান তাঁহার স্বর্গে আছেন,
জগতে কোনও অমঙ্গল সম্ভব নয়।

ব্রাউনিং আস্তিক কবি। ইঁহার অপেক্ষা স্থির বিশ্বাস পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে কোনও কবির রচনার মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সভ্য জগতে ঘোর নাস্তিকতাও সংশয়বাদের প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছিল। বিজ্ঞানের প্রসারের প্রথম তরঙ্গে সভ্য জগতের ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল। সেই তরঙ্গে শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছিল। শেলি, ম্যাথু আরর্ণল্ড, টেনিসন প্রভৃতি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিগণের কবিতায় এই সংশয়ের ছায়া অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়; কিন্তু ব্রাউনিং এই সংশয়ের যুগে অবিশ্বাসের পূর্ণ তরঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও অচল অটল ছিলেন। আজীবন স্থির ও অকম্পিত স্বরে তিনি বিশ্বাসের গীতি গাহিয়াছেন। এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে সংশয়ের ছায়া পড়ে নাই। বাইশ বৎসর বয়সের রচিত প্রথম কবিতা হইতে মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে রচিত শেষ কবিতা পর্য্যন্ত তাঁহার সকল রচনাতে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস, সত্যের জয়, সাধুতার অবিনাশিত্ব নানা ভাবে ঘোষণা করিয়াগিয়াছেন। তাঁহার শেষ কবিতাতে তিনি আপনার বিষয়ে বলিয়াছেন,

কভু ফিরি নাই কর্ত্তব্যের পথে,
চলিয়াছি সম্মুখ সমরে।
আঁধার কাটিয়া যাবে, হয়নি সন্দেহ
সত্যের লাঞ্ছনে, ভাবি নাই মুহূর্ত্তের তরে
অসত্যের হইবে বিজয়।

স্থির জানি, পড়ি উঠিবার তরে,
পরাভব, যুঝিবার লাগি দ্বিগুণ বিক্রমে,
নিদ্রা যাই, জাগিবার তরে।

ব্রাউনিং মানবজীবনের অপূর্ণতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করিতেন, এই অপূর্ণতা মানবজীবনের গৌরব; ইহাতেই প্রমাণ, যে মানবের জন্য আর এক উন্নত ও পূর্ণতর জীবন আছে। মানুষ যদি তাহা ভুলিয়া এই সংসারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে, তাহাই পরিতাপের কারণ; তাহাকেই ভয় করিতে হইবে, পরাজয়কে নহে, পতনকেও নহে। সংগ্রামবিহীন, আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সুখ ও সফলতা অপেক্ষা, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা দীপ্ত পরাজয় ও পতন স্পৃহনীয়। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহাতে দুঃখ নাই; কারণ, এ জগতে এক কণিকা সাধুচেষ্টা, এক তিল মহৎভাব বিনষ্ট হয় না।

কভু নাহি বিনাশ কল্যাণের,
কল্যাণের চেষ্টা, আশা, কামনা, কল্পনা
সবি রবে, ছায়া নয়, পূর্ণ সত্যরূপে।
এ জগতে সত্য শিব সুন্দরের যা কিছু বিকাশ
মৃত্যু নাই তার, ক্ষণেকের কল্পনা
অনন্তে লভিবে পরিণতি।

যে উচ্চ আদর্শ এখানে হলনা আয়ত্ত,
যে বীরত্ব সাধ্যের অতীত ;
যে প্রেম পৃথিবীর ধূলা ছাড়ি আকাশে
হারাল আপনাবে
স্থির জেন অনন্তের পদতলে হয়েছে অক্ষয়।
শুনেছেন ভগবান যাহা একবার,
শুনিবে জগৎ তাহা অনন্ত সময়।

আমবা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাউনিংএর কবিতা অতি কঠিন। তোমবা যে এখন তাহা সম্পূর্ণ বুঝিবে, তাহা আশা করি না। তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম। আশা করি, ইহা হইতে ক্রমে ব্রাউনিংএর সমগ্র রচনার স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য তোমাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে।

পিসিমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতদিন আমি পর পর সমস্ত কথা বলিয়া আসিতে ছিলাম, এক্ষণে তাহা বলিব না ; কারণ, এত কথা বলিবারও অবকাশ হইবে না, কাহারও শুনিবারও ইচ্ছা হইবে না। গৃহস্থেব বাড়ীর প্রতিদিনের ব্যাপার বলিয়াও কোন লাভ নাই। আমাদের জীবনের প্রধান কথাগুলিই এখন হইতে বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামচরণ জ্যেঠাকে সঙ্গে লইয়া বাবা কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমি গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। বাবা প্রায় প্রতি শনিবারেই বাড়ী আসিতে লাগিলেন। রামচরণ জ্যেঠা মাসের মধ্যে দুই তিন বার বাড়ী আসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিয়া যাইতেন, কোন অসুবিধা ছিল না।

এমন ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল ; এ সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে আমরা দেখিতে পাইতাম, বাবা ক্রমেই বাড়ী আসা কম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; যখন আসিতেন তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, কাজকর্ম্ম ক্রমেই বাড়িতেছে, রবিবার পর্য্যন্ত অবকাশ থাকে না ; তাই তিনি অনেক সময় আসিতে পারেন না। এ দিকে বাড়ীর বিষয়কর্ম্মের একটু গোল হওয়ায় রামচরণ জ্যেঠাকেও কিছু দিনের জন্য বাড়ী আসিতে হইল। বাবাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা গোছাল হইয়াছিলেন, রামচরণজ্যেঠাও দেখিলেন, যে বাবা নিজেই সমস্ত করিতে পারেন ; সুতরাং তিনি কলিকাতায় সর্ব্বদা থাকিতেন না ; মধ্যে মধ্যে দুই চারি দিনের জন্য কলিকাতায় যাইতেন।

দুই বৎসর পরে এক শনিবারে বাবা বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার সহিত একটী অপরিচিত ভদ্রলোকও আসিলেন। বাড়ীতে ভদ্রলোক অতিথি আসিয়াছেন দেখিয়া রামচরণজ্যেঠা ও পিসিমা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বাবার এক জন বন্ধু এই পরিচয়ই যথেষ্ট হইল। রাত্রিতে আহারাদি শেষ হইয়া গেল, বাবা বাড়ীর মধ্যে পূর্ব্বের মত আমাদের নিকটই শয়ন করিলেন ; কিন্তু অন্যান্য বারের মত এবার বাবাকে তেমন প্রফুল্ল দেখিলাম না ; তিনি যেন একটু চিন্তিত, তাঁহার মুখ যেন একটু বিষন্ন, অন্ততঃ আমার ত তাহাই মনে হইয়াছিল। পিসিমা বাবাকে যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা অতি সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে বাবা পিসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, যে ভদ্রলোকটী আমার সঙ্গে এসেছেন, তিনি তোমাকে কি বল্‌তে চান। তাকে কি বাড়ীর মধ্যে একবার ডেকে আন্‌ব।"

বাবার কথা শুনিয়া পিসিমা বলিলেন, "আমার সঙ্গে তাঁর কি কথা? বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে যদি কোন কথা থাকে, তাহ'লে এখন ত তুমি বাড়ীতে আছ, তুমিই শুনতে পার। শেষে যদি দরকার মনে কর, তা হলে আমাকে কথাটা জিজ্ঞাসা অরতে পার। অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কি দরকার?"

বাবা বলিলেন "আমি অত কথা জানিনে। তিনি বল্‌লেন যে, তোমাকেই তিনি একটা কথা বল্‌বেন,

আমাকে সে কথা বললেন না। তবে আমি যে কথাটা না জানি তা নয়।”

আমি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। বাবার এই কথা শুনিয়া হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, আমার ভয় হইল। কথাটা ভাল বোধ হইল না।

পিসিমা বাবার কথা শুনিয়া বলিলেন “বেশ ত তুমি যখন জান, তখন আগে তোমার কাছেই শুনি, পরে প্রয়োজন বুঝলে তার মুখেও না হয় শুনব। কথাটা কি?”

বাবা বলিলেন, “তা আমি তোমাকে বলতে পারব না।”

পিসিমা বিস্মিত হইয়া বাবার মুখের দিকে চাহিলেন, পরে ধীরভাবে বলিলেন, “বেশ, তা তাঁকে ডেকে এনে এই ঘরে বসাও, আমি পাশের ঘরে যাই।”

বাবা বাহিরে চলিয়া গেলেন, আমি পাশের ঘরে পিসিমার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম। এ সংসারে এখন পিসিমার কোলই আমার ও আমার ভগিনীর একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। পিসিমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখ বড় বিষণ্ণ, তিনি কি একটা কঠিন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একটু পরে সেই ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া বাবা বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। তিনি আসিয়া এক খানি চেয়ারে বসিলেন, বাবা আর একখানি চেয়ারে বসিলেন, ভদ্রলোকটী তখন পিসিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “আমি বড় বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার নাম শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার। আমার বাড়ী কলিকাতায়; আমরা তিন চারি পুরুষ কলিকাতাতেই আছি। আমাদের আদত বাড়ী হুগলী জেলায় ছিল; এখন আর সেখানে বাড়ীঘর নাই, আমাদের জ্ঞাতিরা গ্রামেই আছেন। আমি একেলা মানুষ; কলিকাতায় এক সওদাগরি আফিসে সামান্য চাকরী করি। মাসে এক শত টাকা বেতন পাই। আজ কাল যে দিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কলিকাতার মত স্থানে এক শত টাকা আয়ে পরিবার লইয়া বাস করা এক রকম অসম্ভব। বাড়ীতে মা আছেন, একটী বিধবা ভগিনী আছেন, তাঁর তিনটী মেয়ে; সেই তিনটী মেয়েকে পার করিতে আমি একরকম সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। বিধবা ভগিনীর শ্বশুরকুলে কেহ নাই; তাঁকে ত আর ফেল্‌তে পারিনে। তাঁর সকল ভারই কুলোতে হয়। আমার দুইটী ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটীই বড়, এই পনর বৎসর যায়। অবস্থা তেমন নয়, যে, অনেক টাকাকড়ি খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিই। পনর বৎসরের মেয়ে, আর ঘরেও রাখা যায় না। আমি চারিদিকে একেবারে অন্ধকার দেখ্‌ছি। তাই আপনার শরণ নিতে এসেছি, আপনি যদি দয়া করেন, তা হলে আমি এই বিষম দায় থেকে উদ্ধার পেতে পারি। পরেশবাবুর কাছে প্রস্তাব করেছিলাম, তিনি বলেন, তিনি কিছুই জানেন না। আপনিই কর্ত্তা। আপনি যা করবেন তাই হবে। সেই জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে এই দায় থেকে উদ্ধার করুন। নিজের মেয়ের কথা নিজের মুখে বল্‌তে নেই; কিন্তু আপনি দেখ্‌লেই মেয়ে পছন্দ করবেন; আর তাকে যে দেখেছে, সেই ভাল বলেছে। পরেশবাবুর ত তেমন বয়সও হয় নাই। এ সময় তাঁকে অবিবাহিত রাখাও ঠিক নয়। আপনি মত করলেই আমি উদ্ধার লাভ করতে পারি।”

রামচরণজ্যেঠাও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে ভদ্রলোকটী বাবার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন এবং বাবা তাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। ভদ্রলোকটীর কথা শেষ হইলে রামচরণ জ্যেঠা আমরা যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরে আসিল। পিসিমা তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। রামচরণজ্যেঠা বলিল, “দিদি, কি বলবে বল?” পিসিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “রামচরণ দাদা, তুমিই যা হয় আমার হয়ে বল। আমি আর কি বল্‌ব।”

রামচরণজ্যেঠা তখন বাহিরে যাইয়া বলিল, “দিদি বলছেন যে, তাঁর ভাই ত আর এখন ছেলে মানুষ নয়, যে দিদি যা বল্‌বেন, যা করবেন, তাই হবে। তার যদি

ইচ্ছা হয়ে থাকে, সে বিয়ে করুক ; তাতে কাহারও কোন আপত্তি নেই, আপত্তি করাও বৃথা।" এই বলিয়াই রামচরণজ্যেঠা চুপ করিল।

ভদ্রলোকটী বলিলেন "আমি ত পরেশবাবুকে সে কথা বলেছিলাম ; তাতে তিনি বল্‌লেন, দিদির মত ব্যতীত তিনি কিছুই করবেন না।''

এই কথা শুনিয়া পিসিমা দ্বারে আঘাত করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া রামচরণজ্যেঠা ভিতরে আসিল। তখন পিসিমা একটু উচ্চ করিয়া বলিলেন, "রামচরণ দাদা, ওঁকে বল যে, পরেশের যদি বিবাহ করিতে ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমরা কেউ তাকে নিষেধ করব না ; আমাদের মতামত জান্‌বার কিছুই দরকার নাই?" এই বলিয়া তিনি সে ঘর হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। ভদ্রলোকটী তখন আর কি করেন ; তিনিও উঠিয়া আমাদের বৈঠকখানার দিকে একাকী চলিয়া গেলেন। বাবা যে ভাবে বসিয়া ছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

তখন রামচরণজ্যেঠা বাবাকে বলিলেন, "ভাই, তুমি বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, তোমাকে উপদেশ দিতে পারি না। তবে আমি এই বুঝি যে, তোমার যদি বিবাহ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তুমি স্বচ্ছন্দে বিবাহ কর। দিদিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা বা তাঁর মত নেওয়ার কোনই দরকার নেই। আর তোমার যে বিবাহ করবার ইচ্ছা হয়েছে, তা ঐ ভদ্রলোকটীকে সঙ্গে করে আনাতেই প্রকাশ পাচ্ছে। এ অবস্থায় দিদির মতের অপেক্ষা করার ত কোন দরকার দেখি নে ; তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার। দিদি তোমার কোন কাজেই বাধা দেবেন না। এখন তুমি বুঝে পড়ে যা ভাল মনে কর, তাই কর।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, বাবার মুখ আরও মলিন হইয়া গেল ; তিনি কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন।

সেই সময়ে পিসিমা সেইস্থানে আসিলেন। তিনি আসিয়াই বাবাকে বলিলেন "পরেশ, তুই কি এখনও ছেলেমানুষই রইলি। ভদ্রলোকটীকে সঙ্গে নিয়ে আসার তোর কি দরকার ছিল? তুই ত জানিস, আমি প্রাণ গেলেও বল্‌তে পারবনা যে তুই বিয়ে কর, আমার সুরেশ খুকী ভেসে যাক্‌। এ কথা কি তুই জানিস্‌নে। তবে আবার আমার মত জান্‌বার জন্য ভদ্রলোককে এতদূর নিয়ে এলি কেন? তোর বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তুই বিয়ে করগে, আমি নিষেধ করব না। কিন্তু আমার মত নিয়ে যে তুই বিয়ে করবি, সুরেশের জন্য যে সৎমা আমি ঘরে নিয়ে আস্‌ব, তা আমি পার্‌ব না। আমাকে ও সম্বন্ধে কোন কথা আর তুই জিজ্ঞাসা করিস্‌ নে।"

পিসিমার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, বাবাও কাঁদিতেছেন। বাবাকে কাঁদিতে দেখিয়া পিসিমার মনে দয়ার সঞ্চার হইল, তাঁহার সেই কঠোরভাব দূর হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বাবার নিকট যাইয়া নিজের আঁচলের কাপড় দিদি তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "দেখ্‌ পরেশ, তুই একেবারেই ছেলে মানুষ। তাই তোর উপর রাগ করাও যায় না। তোর যে মোটেই বুদ্ধি নেই, তাই তোকে বকি। যা, যা, কাঁদিস্‌নে। ভদ্রলোকটীকে বল্‌ গিয়ে যে, এ বিয়েতে দিদির মত নেই, সুতরাং তুই এ বিয়ে করতে পারবি না। তার পর যা হয়, আমি করব।"

বাবা এতক্ষণ কথা বলেন নাই ; কিন্তু এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দিদি, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌ব না, আমার দুর্মতি হয়েছিল ; আমি তোমাদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। না, না, আমার ভুল ঘুচেছে। আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আমি আর কখন বিবাহের কথা মনেও করব না ; তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'' এই বলিয়া বাবা পিসিমার পা ধরিতে গেলেন। পিসিমা তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইয়া বাবাকে কোলের মধ্যে করিয়া বলিলেন, "পরেশ, তুই সত্যসত্যই ছেলে মানুষ ; তোকে আমি মোটেই মানুষ করতে পারলাম না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

দুঃখীরা*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীন ভালজীন পলাতকের ন্যায় সহর হইতে বাহির হইল। শীঘ্র খোলা মাঠে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি সম্মুখে যে রাস্তা পাইল, তাহাই ধরিয়া চলিতে লাগিল; সে বুঝিতে পারিল না, যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে বার বার একই পথ দিয়া যাইতেছিল। সমুদয় প্রাতঃকাল সে এই ভাবে ঘুরিয়াছিল এবং যদিও পূর্ব্ব রাত্রি হইতে তাহার আহার হয় নাই তথাপি কিছুমাত্র ক্ষুধা বোধ করিল না। জীন ভালজীনের হৃদয় বিবিধ নূতন ভাবে অলোড়িত হইতেছিল। সে কিছু বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে বিরক্তি কাহার প্রতি তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে তখন লজ্জিত কি মুগ্ধ, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। এক একবার তাহার মনে কোমলতার আবেগ আসিতেছিল, কিন্তু গত বিশ বৎসরের সঞ্চিত কঠিনতা দ্বারা সে তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সমাজের অন্যায় আচরণে তাহার মনে যে এক প্রকার বিকৃত ধৈর্য্যের বাঁধ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমূল কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। জীন ভালজীন ইহাতে ভীত ও বিরক্ত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এই ধৈর্য্য গেলে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে? এক একবার মনে করিতেছিল, ইহার অপেক্ষা কারাগারে থাকা ভাল ছিল; কারণ তাহাতে তাহার মন এত আলোড়িত হইত না। যদিও তখন প্রায় শীতকাল, তবু তখনও মাঠে বেড়াব গায়ে দুই একটী ফুল ছিল; তাহার সুগন্ধে জীন ভালজীনের মনে বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল; সে স্মৃতি তাহার নিকট অসহ্য মনে হইতেছিল।

সমস্ত দিন এই প্রকার অব্যক্ত চিন্তার পীড়নে জীন ভালজীনের হৃদয় ক্লিষ্ট হইতেছিল। অপরাহ্নে যখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল এবং ক্ষুদ্র শৈলের ছায়াও দীর্ঘ প্রসারিত হইতেছিল, সেই সময়ে জীন ভালজীন এক জনমানববিহীন প্রান্তরে একটী ঝোপের আড়ালে গিয়া বসিয়াছিল। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও দূরে এক খানি গ্রামের গির্জ্জার চূড়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না, কেবল সুদূর আকাশের প্রান্তে আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। জীন ভালজীন ডি—সহর হইতে বোধ হয় কয়েক মাইল দূরে আসিয়া থাকিবে। ঝোপের অনতিদূরে একটী সঙ্কীর্ণ পথ প্রান্তরের উপর দিয়া গিয়াছে। এইস্থানে বসিয়া যখন জীন ভালজীন আপনার চিন্তায় মগ্ন ছিল, তখন অদূরে হাসির শব্দে তাহার চেতনা হইল। মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল যে একটী দশবৎসরের বালক নিকটস্থিত পথ দিয়া যাইতেছে; তাহার পরিধানে জীর্ণবস্ত্র; সচরাচর গ্রামে বা নগরে যে সকল পথবিচারী দরিদ্র বালকবালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এই বালক সেই শ্রেণীর। ছেলেটী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল; তাহার হাতে কয়েকটী মুদ্রা ছিল; হয়ত সেই কয়টী তাহার একমাত্র সম্বল; সে মাঝে মাঝে থামিয়া সেগুলি আকাশের দিকে ছুড়িতেছিল, আবার মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা ধরিতেছিল। এইরূপে আপনার মনে খেলিতে খেলিতে সে চলিয়াছিল। নিকটেই ঝোপের পাশে যে একজন লোক বসিয়াছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। একবার সে যেই মুদ্রাগুলি ছুড়িল, তাহার মধ্য হইতে একটী দুই ফ্রাঙ্কের মুদ্রা তাহার হাতে না পড়িয়া মাটীতে পড়িল এবং গড়াইতে গড়াইতে জীন ভালজীনের পায়ের নিকটে গিয়া থামিল। জীন ভালজীন তৎক্ষণাৎ পা দিয়া সেটী চাপিয়া ধরিল। বালকটীর চক্ষু সেই দিকেই ছিল, সুতরাং সে তাহা দেখিতে পাইল। সে শান্তভাবে জীন ভালজীনের নিকট গেল। স্থানটী সম্পূর্ণ নির্জ্জন, কোথাও জনমানব নাই; চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল একদল দুরন্ত আকাশচারী পক্ষীর কলরব অস্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। বালকটী জীন ভালজীনের নিকটে গিয়া বালসুলভ বিশ্বাসের সহিত বলিল, "মহাশয়, আমার মুদ্রাটী!" জীন ভালজীন বলিল "তোমার নাম কি?"

* ফরাসী গ্রন্থকার ভিক্টর হুগোর Les Miserables নামক গ্রন্থের বালকবালিকাদের উপযোগী বঙ্গানুবাদ।

"জার্ভিস।"

জীন ভালজীন বলিল "পলাও"

"অনুগ্রহ করিয়া আমার মুদ্রাটী দিন।"

জীন ভালজীন কিছু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।"

তখন বালকটী আবার বলিল, "আমার মুদ্রাটী!"

জীন ভালজীন বোধ হয় তাহার কথা শুনিতে পায় নাই। বালকটী তাহার কোট ধরিয়া একটী নাড়া দিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে পায়েব নীচে মুদ্রাটী ছিল তাহা সবাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

বালকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমার মুদ্রা, আমার দুই ফ্রাঙ্ক দিন।" জীন ভালজীন এতক্ষণ পরে মাথা তুলিল; সে তখনও পূর্ব্বের মত বসিয়াছিল; তাহার চক্ষু বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে একবার বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে জার্ভিসের দিকে চাহিল; পরে তাহার লাঠির দিকে হাত বাড়াইয়া কঠোরস্বরে বলিল, "কে ওখানে?"

বালকটী উত্তর করিল, "আমি জার্ভিস! অনুগ্রহ করিয়া আমার দুই ফ্রাঙ্ক দিন; আপনার পা খানি সরাইয়া লউন।" তাহারপরে সে বিরক্ত হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনি পা সরাবেন কি না?"

"বন্ধু যাইবার পূর্ব্বে আপনার বাতিদানী দুইটী লইয়া যান"

এইবার জীন ভালজীন দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "বটে, তুমি এখনও এখানে আছ? এখনি এখান হইতে যাবে কি না বল?"

বালকটী তাহার দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; এবং ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে থাকিয়া বেগে পলায়ন করিল, একবারও পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। অনেকদূর গিয়া সে যখন দম লইবার জন্য একটু থামিয়াছিল, তখনও জীন ভালজীন শুনিতে পাইল যে সে কাঁদিতেছে। অল্পক্ষণ পরে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল। জীন ভালজীনের চারিদিকে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, এবং বোধ হয় তাহার জ্বর হইয়াছিল। বালকটী চলিয়া যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জীন ভালজীন সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। দীর্ঘ

নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুক উঠিতে এবং পড়িতেছিল; তাহার দৃষ্টি সম্মুখে আট দশ হাত দূরস্থিত একখানি ভাঙ্গা কাচে আবদ্ধ ছিল। মনে হইতেছিল, সে যেন গভীর মনোযোগের সহিত তাহারই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার চেতনা হইল; তখন সে তাহার মাথার টুপিটা টানিয়া কপালের উপর দিল। কোটের বোতাম লাগাইয়া মাটী হইতে তাহার লাঠি গাছটী উঠাইয়া লইতে অগ্রসর হইল। সেই মুহূর্ত্তে জীন ভালজীনের দৃষ্টি সেই বালকের মুদ্রাটীর উপরে পড়িল। তাহার পায়ের চাপে সেটী মাটীতে অর্দ্ধপ্রোথিত হইয়াছিল, কিন্তু তবুও মৃত্তিকার মধ্যে তাহা চক্ চক্ করিতেছিল। এই দৃশ্যে জীন ভালজীনের শরীরের ভিতর দিয়া যেন বৈদ্যুতিকপ্রবাহ সঞ্চারিত হইল। অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল "এটা কি?" অজ্ঞাতসারে সে দুইতিন পা পিছাইয়া গেল, আবার আসিল, কিন্তু ক্ষণকাল পূর্ব্বে যেখানে তাহার পা ছিল, তাহা হইতে কোনও মতেই দৃষ্টি সরাইতে পারিল না। তাহার মনে হইল, যেন সেখানে কাহার ও চক্ষু আছে; সেটী যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অল্পক্ষণ পরে সে ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া মুদ্রাটী কুড়াইয়া লইল; তৎপরে কাঁপিতে কাঁপিতে ভীত পশু যেমন আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করে, সেইরূপ প্রান্তরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু জীন ভালজীন কোনও কিছু দেখিতে পাইল না।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। প্রান্তরের চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এবং শীত ও তীব্র বোধ হইতেছিল। যে দিকে সেই বালকটী গিয়াছিল জীন ভালজীন দ্রুতবেগে সেই দিকে অগ্রসর হইল। কিছু দূর গিয়া সে থামিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখে চক্ষু প্রসারিত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন সে প্রাণপণ শক্তিতে "জার্ভিস্" "জার্ভিস্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তারপরে কোনও উত্তর আসে কিনা স্থির হইয়া শুনিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও উত্তর শুনিতে পাইল না। চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না; ওদিকে ক্রমে বরফের মত শীতল বাতাস প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। বাতাসে ঝোপের ডালগুলি নড়িতেছিল, যেন তাহারা হাত নাড়িয়া কাহাকেও ভয় দেখাইতেছিল।

জীন ভালজীন আবার হাঁটিতে লাগিল, মনের ব্যগ্রতাতে তাহার গতি আপনা হইতেই বাড়িতেছিল. অবশেষে সে দৌড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে থামিয়া সে জার্ভিসের নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল। তাহার স্বরে এমন এক কাতরতা ছিল যে সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জার্ভিস যদি তাহা শুনিতেও পাইত, তাহা হইলে আশ্বস্ত না হইয়া সে ভীতই হইত। কিন্তু জার্ভিস্, সম্ভবতঃ তখন অনেক দূরে ছিল। জীন ভালজীন পথে একজন অশ্বারোহী গ্রাম্য পুরোহিত দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় এই পথ দিয়া কি একজন বালককে যাইতে দেখিয়াছেন?" পথিক বলিলেন "না।" জীন ভালজীন আবার বলিল "জার্ভিস্ নামক একটী ছোট ছেলে?" পথিক উত্তর করিলেন "না, আমি কাহাকেও দেখি নাই।"

জীন ভালজীন তখন আপনার কোটের পকেট হইতে দুইটী পাঁচ ফ্রাঙ্কের মুদ্রা বাহির করিয়া পুরোহিতের হাতে দিয়া বলিল "আচার্য্য মহাশয়, এই দুইটী আপনার মণ্ডলীর দরিদ্রের জন্য। সে ছেলেটীর বয়স দশবৎসর হইবে, এবং তাহার কাপড় ছেঁড়া।"

"আমি তাহাকে দেখি নাই।"

"আপনি কি বলিতে পারেন নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে জার্ভিস্ নামে একটী ছোট ছেলে আছে কি না?"

"তুমি যেরূপ বিবরণ দিলে তাহাতে মনে হয় বালকটী এ অঞ্চলের নয়; অন্যস্থান হইতে আসিয়া থাকিবে। এপথ দিয়া অনেক লোক যায়।"

জীন ভালজীন তাহার কোটের পকেট হইতে ব্যগ্রভাবে আরও দুইটী পাঁচফ্রাঙ্কের মুদ্রা বাহির করিয়া সেই পুরোহিতকে দিয়া বলিল "ইহাও দরিদ্রের জন্য।" তৎপরে আবার বলিল "আচার্য্য মহাশয়, আমাকে ধরাইয়া

দিন; আমি ডাকাত।" পুরোহিত এই কথা শুনিয়া বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল; জীন ভালজীন যে পথে চলিতেছিল সেই পথে দৌড়িয়া অগ্রসর হইল। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইভাবে চীৎকার করিতে করিতে চলিল। দুই তিনবার তাহার মনে হইল কে যেন পথ পার্শ্বে শুইয়া আছে; কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিল যে তাহা প্রস্তরমাত্র। অবশেষে সে একস্থানে উপস্থিত হইল, সে খান হইতে তিন দিকে তিনটী পথ গিয়াছে। ইতিমধ্যে আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। চাঁদের আলোতে কিছু দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। সেই চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া জীন ভালজীন শেষ বার "জার্ভিস্" "জার্ভিস" বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার শব্দ কুয়াশার মধ্যে ডুবিয়া গেল, প্রতিধ্বনিও শুনা গেল না। তৎপরে ক্ষীণস্বরে সে আবার ডাকিল "জার্ভিস।" এই তাহার শেষ চেষ্টা; তাহাব জানু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; কোনও এক অদৃশ্যভাবে সে যেন পিষিয়া যাইতেছিল। অবসন্ন হইয়া জীন ভালজীন একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল; দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি কি পাষণ্ড!" তাহার হৃদয় গলিয়া গেল; সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। উনিশ বৎসরের পরে এই তাহার প্রথম ক্রন্দন।

জীন ভালজীন যখন বিশপের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, তখন তাহার মন পুরাতন ভাব ও চিন্তা অতিক্রম করিয়াছিল; তাহার মনে যে কি তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। বৃদ্ধ বিশপের স্বর্গীয় ব্যবহার ও মিষ্ট বাক্যের বিরুদ্ধে সে আপনার মন দৃঢ় বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছিল। তিনি যে বলিয়াছিলেন "তুমি সৎলোক হইবার জন্য আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছ, আমি তোমার আত্মা কিনিয়া লইয়াছি; আমি তাহাকে পাপের নিকট হইতে ফিরাইয়া ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছি, এই কথা বার বার তাহার মনে উঠিতেছিল। কিন্তু জীন ভালজীন এই সাধু উদ্দীপনার বিরুদ্ধে মানবপ্রকৃতি নিহিত অহঙ্কার উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল, যে এ পর্য্যন্ত তাহার জীবনে যত কিছু বিপ্লব আসিয়াছে তাহার মধ্যে এই ধর্ম্মযাজকের ক্ষমাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মভেদী; যদি সে ইহা অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের কঠিনতা চিরস্থায়ী হইবে; আর যদি সে ইহার নিকট পরাস্ত হয় তাহা হইলে সে মানবসমাজের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া এতদিন আনন্দ পাইয়াছে, তাহাকেও বিদায় দিতে হইবে। জীন ভালজীন জীবনের এক গুরুতর সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; জীন ভালজীনের আত্মার মধ্যে নিজের দুর্ব্বৃত্ততা ও বিশপের সাধুতায় এক তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল; ইহাতে হয় সে জিতিবে না হয় হারিবে। এই সংগ্রামের ফল কি হইবে তাহা বলা যায় না; কিন্তু এখানে মধ্যপথ কিছু নাই। এই সংগ্রাম হইতে জীন ভালজীন হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু না হয় নরাধম হইয়া বাহির হইবে।

এই সংগ্রামের ভারে জীনভালজীন মাতালের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল। তাহার বাহ্যস্মৃতিও লুপ্ত হইয়াছিল। সে ডি—সহর হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহার বিষয় লইয়া সেখানে পথে ঘাটে বাজারে কত কথা হইতেছিল সেদিকে তাহার চিন্তাই হইল না। তাহার মনে যে ঘোর পরিবর্ত্তন আসিতেছে, তাহাও সে জানিত না। মনের এই অবস্থায় জার্ভিসের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, এবং সে তাহার দুই ফ্রাঙ্ক অপহরণ করে। সে যে কেন ইহা করিয়াছিল, তাহা সে বুঝাইতে পারিত না। এটা কি তাহার এতদিনের সঞ্চিত প্রকৃতিগত পাপবুদ্ধির অন্তিম চেষ্টা? বোধ হয় তাহাই হইবে। বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে একাজ সে করে নাই, কিন্তু তাহার বিবেক যখন নূতন ভাবে মগ্ন ছিল সে সময়ে মানুষের মধ্যে যে পশু ভাব আছে তাহাই অজ্ঞাতসারে তাহাকে চালিত করিয়াছিল। সে বহুদিনের অভ্যাসবশে অজ্ঞাতসারে জার্ভিসের মুদ্রার উপরে তাহার পা উঠাইয়া দিয়াছিল। পরে যখন বিবেকের চেতনা হইল, এবং এই পাশবিক কার্য্যের জঘন্যতা দেখিল, তখন জীন ভালজীন তীব্র যাতনায় কাঁদিয়া উঠিল।

সে যাহাই হউক তাহার অন্তরে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, এই শেষ অসদাচরণে তাহার চরম মীমাংসা হইয়া গেল। কোনও দূষিত জলীয় দ্রব্যে এক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ঢালিয়া দিলে যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে দূষিত বস্তু জল হইতে পৃথক হইয়া যায়, সেইরূপ জীন ভালজীনের মনের মধ্যে যে দুর্ব্বোধ্য গোলমাল চলিতেছিল, এই ঘটনায় তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল,—যত মলিনতা, যত অন্ধকার একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল অপর দিকে আলোক উজ্জ্বল হইল। প্রথমে ভাল করিয়া আপনার মনের অবস্থা বুঝিবার পূর্ব্বেই, জীন ভালজীন সেই বালকটীকে খুঁজিয়া তাহার টাকা তাহাকে প্রত্যপণ করিবার জন্য পাগলের মত চেষ্টা করিল। কিন্তু যখন দেখিল তাহা অসম্ভব, তখন সে নিরাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। যখন সে বলিয়াছিল "আমি কি পাষণ্ড" তখন সে নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং তাহার পুরাতন জীবন হইতে বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যে সে আর জীন ভালজীন নয়; সে আর কেহ, এবং তাহার সম্মুখে কারারুদ্ধ জীন ভালজীন হলুদে টুপি মাথায়, পিঠে ব্যাগ লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যে বহু কষ্টে জীন ভালজীনের প্রকৃতি কল্পনাপ্রবণ হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময় সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিত। এটাও যেন একটা স্বপ্ন; সে যেন সম্মুখে কয়েদী জীন ভালজীনকে দেখিতেছিল, এবং এই ভীষণপ্রকৃতি লোকটা কে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল। অপর দিকে সে যেন একটী অপার্থিব আলোক দেখিতে পাইতেছিল। মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মনে হইল তাহা আলো নয়, একজন মানুষ, তাঁহার মস্তক হইতে অপার্থিব রশ্মি নির্গত হইতেছে, আরো ভাল করিয়া দেখিয়া সে বুঝিল, তিনি ডি—সহরের বিশপ। সে বিবেকের আলোকে তাহার সম্মুখস্থিত এই দুই মনুষ্যমূর্ত্তি বার বার পরীক্ষা করিতে লাগিল,—একদিকে বিশপ, অপর দিকে জীন ভালজীন! যত সে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইল, যেন বিশপের মূর্ত্তি বৃহৎ হইয়া যাইতেছে, অপরদিকে জীন ভালজীন ছোট হইতেছে। ক্রমে জীন ভালজীন ছোট হইতে হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, অপরদিকে বিশপ বড় হইতে হইতে একেবারে সমগ্র দৃষ্টি অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

জীন ভালজীন অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। সে এমন কাঁদিতেছিল, যে তাহাকে দেখিয়া মনে হইত সে স্ত্রীলোকের অপেক্ষাও দুর্ব্বল, এবং ক্ষুদ্র শিশুর চেয়েও ভীত। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষুতে এক অপার্থিব জ্যোতি আসিল। সেই আলোকে তাহার পুরাতন জীবন, প্রথম অপরাধ, পরবর্ত্তী দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত, অন্তরের কাঠিন্য, বাহিরের পশুত্ব, কারাগার হইতে মুক্তি ও প্রতিহিংসার কল্পনা, বিশপের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সেখানকার সমুদয় ঘটনা, শেষ পাপ, বালকের মুদ্রা অপহরণ, এই সমুদয় তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে তাহার সম্মুখস্থ জীন ভালজীনের দিকে চাহিল,—কি ভীষণ! আত্মার দিকে দেখিল—কি জঘন্য। তথাপি তাহার উপরে কি এক স্নিগ্ধ আলোক আসিয়া পড়িতেছিল!

সে এই ভাবে কতক্ষণ কাঁদিয়াছিল? তাহার পরে কি করিয়াছিল? কোথায় গিয়াছিল? কেহ তাহা জানিত না। তবে শুনা গিয়াছিল, যে সেই রাত্রিতে গ্রীনোবল সহরের ডাকওয়ালা রাত্রি ৩ টার সময় ডি—সহরে আসিয়া পৌঁছিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে একজন লোক বিশপের বাড়ীর সম্মুখ পথে পাথরের উপরে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

সেবার গৌরব

মনমুখ দাস কায়স্থ সাধু,
সাধু সেবার তরে
সস্ত্রীক যেন লইলা জনম
নিঠুর অবনী 'পরে!

ভক্ত প্রেমিক পবিত্র চিত
চরিত্র সুমধুর—
হেরিলে তাঁদের হয়ে যায় যেন
সকল দুঃখ দূর!
সকলে দোঁহায় ভালবাসে কত,
তাঁরা সবে ভালবাসে,—
আপন কি পর নাহি সংসারে
সাধুদম্পতি পাশে।
এক দিন যেন দৈবের লিখন
সন্ন্যাসী এক আসি'
মনসুখ কাছে মণ্ডা মেঠাই
খাইবারে অভিলাষী।
দরিদ্র সাধু পড়ে চিন্তায়
তঙ্কা কোথায় পাবে,—
করেনিত ঋণ জীবনে কখন
কার দ্বারে আজ যাবে।
প্রাণ প্রিয়তমা প্রেয়সী তাঁহার
শুনিয়া সকল কথা,
কহেন হাসিয়া "ভাবনা কি দেব,
ত্যজ বৃথা আকুলতা!
দিতেছি খুলিয়া নিয়ে যাও এই
আমার নাকের দুল.
সাধু-সেবা এতে হবে নিশ্চয়
কিছুত নাহিক ভুল!"
এত কহি দেবী জগতের যাহা
অতি প্রিয় রমনীর,
খুলে দিলা সেই গহনা নিজের
নিষ্ঠায় সুগভীর!
মনসুখ দাস বেনিয়ার পাশে
বন্ধক রাখি তায়,
যোগাইলা সুখে যতির মেঠাই
সে যাহা খাইতে চায়!
মনসুখ-বধূ গহনা বিহীনা
হেরি হরি কৃপাময়,
চিন্তিলা মনে 'ভক্ত আমার
কেনবা বেদনা সয়?'
মনসুখ বেশে পোদ্দার হতে
উদ্ধার করি দুল,
সাধ্বী নারীর নিকটে আসিয়া
কহিলা হর্ষাকুল;—
"এই লও দুল. হল সাধু সেবা,
পেয়েছি অর্থ আন্।"
কহিলেন সতী "তুমি দাও নাথ,
করাইয়া পরিধান!"
প্রেমময় হরি সস্নেহে তাঁর
মিটাইলা মনোআশ,—
পরশন সুখে কি সুধা উথলে
অতুলন অবিনাশ!
মনসুখ যবে ফিরিলেন ঘরে
বিস্মিত অতিশয়,—
শুধাইলা "প্রিয়ে কোথা পেলে দুল,
রহস্য একি হয়?"
কহিলা সাধ্বী "এত ভুল তব!
এখনিত নিজ করে,
এ দুল আমায় পরায়ে দিয়েছ
কতই প্রেমের ভরে!
তোমার মধুর পরশ এখনো
আমার অঙ্গে জাগে,—
ক্ষণিকে তা' তুমি ভুলিলে কেমনে
আমি যে শুধাই আগে!"
মনসুখ দাস বুঝিলা নিমেষে
এ লীলা কাহার হায়,
কহিলা কাঁদিয়া "লীলাময়!
কি দোষ করেছি পায়!
সেবার গৌরব রাখিলে দাসীর
আপনি সাক্ষাৎ দিয়া,
পদ ধূলি নিতে বঞ্চিত শুধু
হল এ অধম হিয়া!"

বিনুর কাণ্ড।

বিনু ভারি দুষ্টু মেয়ে; নিরু ভাল মেয়ে। দুজনেই জগদম্বা পিসির বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়ে। তাঁহার সঙ্গে দুজনেরই দূর সম্বন্ধের আত্মীয়তা; তাই মুখে পিসি বলিয়া ডাকে। পিসির মেজাজটিও কিন্তু বড় কড়া; তিনি মেয়েদের সামান্য কারণেই গালাগালি দেন।

প্রথম দৃশ্য।

বিনু ও নিরু।

বিনু।

মাগো মা! চুপটি করে আছিস চক্ষু বুজে,
সারামুলুক ঘুরে বেড়ালুম শুধু তোরে খুঁজে?

নিরু।

খুঁজলে আমায় কেন ভাই?

বিনু।

ছুটির কথা শুনিস নাই?
কয়টা দিন কাটাতে চাই ফুর্ত্তি টুর্ত্তি করে,
লুকিয়ে তাই তাস কিনেছি বামন'দিকে ধরে।
জগদম্বা পিসির কথা ভেবে করে ভয়,
জান্‌লে হবে কুরুক্ষেত্র, নয় একটা প্রলয়!
বপ্‌রে বাপ! মুখখানিতে যেন ক্ষুরের ধার,
রেগে গেলে কারোপরে রক্ষা নাইক আর?
একটা ছুটি পেয়ে একবার যেতে পাল্লে ঘরে
ফিরে কি আর আসব আমি গালি খাবার তরে?
বকুনি যখন চল্‌তে থাকে মর্ম্ম ছিঁড়ে যায়
ডেঞ্রে পিপড়ের কামড় যেন লাগে এসে গায়?

নিরু।

দোষ কর তাই গালি খাও, থেকো ভাল ভাবে,
তা হলে পিসির তুমি ভালবাসা পাবে।

বিনু।

ঢের দেখেছি ভাল হয়ে, তাতেও রক্ষা নাই,
সারাদিন শুধু হুকুম মানা চাই;
হাস্‌বেও না খেল্‌বেও না গম্ভীর হয়ে রবে,
জগদম্বা পিসি তোমায় ভাল বাস্‌বেন তবে!
আমার যে ভাই হাসি খেলা লাগে শুধু ভালো।
দেখ্‌ না চেয়ে চাঁদ উঠেছে কেমন দিব্বি আলো;
আয় ভাই এখন ছাদের পরে মধুর জ্যোছনায়।
মজা করে তাসের খেলা খেলি দুজনায়।

নিরু।

তাসের খেলা কিছুতেই খেলবনাক ভাই।

বিনু।

দোষ কি তাতে আছে কিছু? শুন্‌তে আমি চাই।

নিরু।

মা যে তাসের খেলা মোটে দেখতে পারেন না,
বারণ আছে বলে তাঁর, আমিও খেলি না।

বিনু।

তোর যে দেখি সব বিষয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি!
মাগো মা! ঐ যে পিসি আস্‌ছে তাড়াতাড়ি!

(জগদম্বা পিসির প্রবেশ)

জগদম্বা।

নিরুর তুমি বাড়াবাড়ি দেখতে পেলে কিসে?
সন্ধ্যে বেলায় তাস খেলে না তোমার দলে মিশে;
লুকায়ে বামুন বউকে দিয়ে কেন ভস্ম ছাই,
নিরুপমার তেমন দোষ কোন দিনই নাই।
তুমি বেড়াও ফুর্ত্তি করে নিরু করে পড়া,
কাজের কথা বল্লে তোমায় অগ্নি ফোঁস করা;
তাই বুঝি আজ বাড়াবাড়ি দেখছ তুমি তার!
বলা হচ্ছে ক্ষুরের মত মুখে আমার ধার!
কব আর কি, ঠোঁটে যদি লজ্জা কিছু থাকে?
ভাল চাও ত তাস দিয়ে দাও এখনি আমাকে।
দেশলায়ের আগুন দিয়ে পুড়ায়ে করব ছাই;
মাগো মা! এমন মেয়ে কোথাও দেখি নাই!

(প্রস্থান)

বিনু।

যেখানেই বাঘের ভয়,
সেইখানেই রাত্তির হয়!
মনে কল্লুম খেলব তাস লুকিয়ে তোরে ডেকে,
ঝড়ের মত পড়্‌ল এসে পিসি কোথা থেকে!

সব কথাই আড়ি পেতে শুনে ফেল্লে হায়,
হায়রে কপাল এখন গিয়ে পালাব কোথায়!
ছুটিব যেগো চারটে দিন মাটি হবে খালি,
বসে বসে দিন রাত্তির শুন্‌তে হবে গালি!

নিরু।

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল,
চোখ দিয়ে এখন ঝরুক জল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জগদম্বা।

আমা হেন মানুষকেও দিতে চাচ্ছেন ফাঁকি!
পড়া নাই শুনা নাই শুধুই চালাকি!
পরীক্ষা আজ, দেখি গিয়ে লুকিয়ে বিনির ঘরে
পড়ার বই পড়ে না সে আর কিছুই করে।

(প্রস্থান)

(এক দিকে জগদম্বা দিদি, অপর দিকে
বই হাতে বিনি হাসিতেছে।)

জগদম্বা।

পড়চে বটে! দেখতে পাচ্ছি বিনির হাতে বই।
ও মাগো! ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌ছে কেন অই?
হাতে যে ওর ব্যাকরণ; সন্ধি সূত্রে তার
থাকৃতে পারে এমন কি হাসির কথা আর?
হয় ত পড়ার বয়ের ভিতর লুকানো কিছু আছে,
যাই ত আমি একটিবার শুধাই গিয়ে কাছে?

(বিনুর কাছে গিয়া)

হারে বিনি, বল দেখি তুই কারক সমাস পড়ে,
হেসে হেসে সারা হচ্ছিস কেন অমন করে?

বিনু।

হাস্‌ব না ত কাঁদব নাকি? বলছ তুমি বেশ?
এটা বুঝি তোমাদের উল্টা রাজার দেশ?
ব্যাকরণ পড়্‌তে হলে হাস্‌বে না কেউ আর,
গম্ভীর হয়ে থাকৃতে হবে সকল সময় তার?
কি করা যায়? মনে মনে পাচ্ছে বড় হাসি,
বাহিরে তাই মুখের উপর ফুটে পড়ছে আসি!

জগদম্বা।

শোন একবার কথার ছিরি! ন্যাকামি কেমন?
বলি, আমার কাছে ও চালাকি খাটবে না এখন!
দাও ত দেখি কেতাবখানা হাতের উপর মোর,
খুঁজে দেখি কি লুকানো ভিতরটিতে ওর?

(জগদম্বা বই টানিয়া লইল এবং বাহির ভিতর হইতে
একটা গল্পের বহি বাহির হইল।)

জগদম্বা।

ওগো তোমরা দেখছ সবে, দেখছ মেয়ের কাজ?
সব সরিয়ে কথা বল্‌তে মুখেও নাই লাজ।
গল্পের একটা ছোট্ট কেতাব বয়ের মধ্যে রেখে
পড়ছে আর হেসে উঠছে শুধু থেকে থেকে!
শোন মেয়ে সোজা কথা, অমন কল্লে ছল,
আমার বাড়ী হতে তোমার উঠবে অন্ন জল।

বিনু।

মাপ কর আজ, দোষের কথা বল না লোক ডেকে,
ভাল হতে করব চেষ্টা আমি এখন থেকে।

গান।

এক পর্ব্বতের পাদদেশে এক কুটিরে সাতজন লোক বাস করিত। তাহারা দরিদ্র শ্রমজীবী, সারাদিন জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কঠিন শ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে দুঃখের কুটিরে ফিরিয়া আসিত। নিকটে এক নির্জ্জন উপত্যকায় তাহারা উপাসনার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। সেস্থানটী ফুলের সুগন্ধে সর্ব্বদা পূর্ণ; চারিদিকের সুন্দর দৃশ্যে মনে আপনা হইতেই উচ্চভাব আসিত।

এই সাতজন শ্রমজীবী সকলেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার তাহাদের জরাস্খলিত কম্পিত কণ্ঠে সন্ধ্যাকালে যখন ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিত, যখন তাহারা ভক্তিগদ্‌গদ্‌স্বরে তাঁহার বন্দনা গান গাহিত, তখন তাহাদের রূঢ় ও কর্কশ কণ্ঠের বিকৃত ধ্বনিতে বিরক্ত ও ভীত হইয়া পক্ষিগণ সে বন ছাড়িয়া উড়িয়া পলাইত। কিন্তু কণ্ঠস্বর কর্কশ হইলে কি হয়, যে খানে যে প্রাণের

সহিত একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকে তাহাতেই তাঁহার প্রকৃত পূজা করা হয়; মর্ম্মের গভীর স্থান হইতে ভগবানের উদ্দেশে যে বন্দনাধ্বনি উত্থিত হয় তাহার নিকট তানলয়বিশুদ্ধ মধুর স্বর অতি তুচ্ছ।

প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে ও কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা যখন প্রাণমনে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকে তখন সে স্থান অপূর্ব্ব স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাদের প্রাণের একাগ্রতা তাহাদের কর্কশকণ্ঠের সকল দোষ ঢাকিয়া ফেলে।

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে যখন সূর্য্যের আলোক নিবিয়া আসিতেছিল তখন একজন সুন্দর বালক তাহাদের কুটিরদ্বারে সমাগত হইয়া সেরাত্রির মত আশ্রয় চাহিল। তাহারা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে সে বালক কৃতজ্ঞতাভরে তাহাদের বন্দনা গান করিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠ কিন্নরের মত মধুর, বৃদ্ধকয়জন তাহাকে তাহাদের পূজার স্থানে লইয়া গেল; তাহারা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল, আর বালক তাহার মধুর কণ্ঠে প্রভু পরমেশ্বরের বন্দনা গান গাহিতে লাগিল। নির্জ্জন শৈলকন্দরে সেই গান ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; সপ্ত উপাসকের সমগ্র হৃদয়মন সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

সেই রাত্রিতে বৃদ্ধ সাতজন নিদ্রাবস্থায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিল,— দেখিল এক দেবদূত গম্ভীর মূর্ত্তিতে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি কহিলেন "প্রতিদিন আমরা স্বর্গ হইতে তোমাদের বন্দনাগীত শুনিয়া থাকি আজ তাহা শুনিতে পাই নাই কেন?" তাহারা বালকের গানের কথা কহিল। দেবদূত হাসিয়া কহিলেন "তাহাত গান; তাহাতে বিচিত্রস্বরের বিন্যাস ছিল, কিন্তু তাহাত প্রার্থনা নয়; কারণ তাহাত প্রাণের মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত হয় নাই, তাহা প্রাণমন দিয়া গীত হয় নাই। তোমরা স্বরের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বিরত ছিলে? স্বরের ভাল মন্দে কিছু আসে যায় না; প্রাণের মধ্য হইতে যে সঙ্গীত উত্থিত হয় ঈশ্বর তাহাতেই সন্তুষ্ট হন।" এই বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইল।

তাহার পর হইতে তাহারা তাহাদের জরাস্খলিত কর্কশ স্বরেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইত। তাহারা আর মধুর স্বরের জন্য ব্যগ্র হইত না।

জন্ম পল্লী!

লহর তোলা নদীর কোলে
ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি,
চামড়া ঝোলা বুড়ির কোলে
ঝাঁকড়া চুলো খুকুমনি।
চলার শক্তি নাইকো বুড়ির,
ধনুব মতন বাঁকা মাজা,
দুপর সন্ধ্যা আছেন ব'সে
অঙ্কে খুকু চিকুর সাজা।
হর্ষে খুকুর দোদুল চরণ
পাখীর ডাকে নূপুর বাজে
জ্যোছনার আলো রবির করে
খুকুর হাসি সদাই রাজে।
সমীর বাছা চেরণ হতে
পরায় সিঁথে খুকুর মাথে,
লতার কাঁকন সদাই দোলে
খুকুর শ্যামল কোমল হাতে।
একবার ওমা দেনা তুলে
তোর খুকুরে আমার কোলে,
রাখ্‌ব তারে প্রাণের মাঝে
বাস্‌ব ভাল পরাণ খুলে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

মার্টিন লুথার।

খৃষ্টীয সমাজ প্রধানতঃ দুটী শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একটীর নাম রোমান কাথলিক, অপরটীর নাম প্রটেষ্টাণ্ট। কাথলিক শব্দের অর্থ সার্ব্বভৌমিক। রোমের পোপ এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মগুরু বা মোহন্ত, এই জন্য ইহার নাম রোমান কাথলিক। রোমান কাথলিকদিগের বিশ্বাস যে পোপ অভ্রান্ত গুরু; তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য; এমন কি তিনি যাহার পাপ ক্ষমা করেন, তাহার পাপ মোচন হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্ম্মানীতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমত প্রথম আবির্ভূত হয়; তাহার পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র ইউরোপ রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রটেষ্টাণ্টগণ বলেন যে রোমান কাথলিক ধর্ম্মের আবর্জ্জনা বা কুসংস্কার পরিহার করিয়া তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত সারভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, জার্ম্মানী, সুইজারলণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ লোক এই সম্প্রদায় ভুক্ত। ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি দেশ অদ্যাপি প্রধানতঃ রোমান কাথলিক মতাবলম্বী। যে মহাত্মার নাম এই প্রবন্ধের শিরোদেশে লিখিত হইল সেই মার্টিন লুথারই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

লুথারের পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন; শ্লেটের খনিতে কুলির কাজ করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পরে তিনি মেগডিবার্গ নগরে গিয়া কর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ১৪৮৩ খৃঃ মার্টিনের জন্ম হয়। মার্টিন বাল্যকালে স্থানীয় পাঠশালায় সামান্য বিদ্যাভ্যাস করেন। তাঁহাকে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইসেনাক (Eisenach) নামক স্থানে একটু উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। এই খানে অন্যান্য দরিদ্রবালকদিগের সহিত পথে পথে গান করিয়া মার্টিনকে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সুকণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া নগরের একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা পুত্রবৎ স্নেহের সহিত তাঁহার শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তিনি লাটিন, গ্রীক, ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাইবেল গ্রন্থের কোন কোন অংশও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হন নাই। ১৫০২ খৃঃ মার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করেন।

কিছু দিন পরে মার্টিনের একজন অতি প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু হয় ও তিনি নিজে কঠিন রোগাক্রান্ত হন। ব্যাধিমুক্ত হইয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী (monk) হইবার সংকল্প করেন। ১৫০৫ খৃঃ দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি একটী অগষ্টিনিয়ান সন্ন্যাসীদিগের মঠে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে বহিঃসংসারের চিহ্ন স্বরূপ একখানি ভার্জ্জিলের মহাকাব্য ও আরও একখানি লাটিন পুস্তক সঙ্গে লইয়া গেলেন।

লুথারের অন্তরে পাপবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রলোভনময় সংসার হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াও তাঁহার মনে শান্তি আসিল না। এই মঠে তিনি একখানি সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেন ও আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। এই পুস্তক পাঠে ও মঠের উপদেশ ও শিক্ষায় তাঁহার মনে পাপের জন্য অনুশোচনা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। রিপুসংগ্রামে তিনি প্রাণপণ করিলেন ও দিন দিন নূতন নূতন কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা শরীরকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলেন। মঠের সকলে তাঁহাকে নবীন সাধু বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল। কিন্তু লুথার নিজের মনের ভিতর পরমেশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে যে পরমেশ্বর মানুষকে অনন্ত নরকে দগ্ধ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন সে পরমেশ্বরের উপরে তাঁর ভক্তি ত নাই-ই বরং বিদ্বেষ ভাব রহিয়াছে। মঠের কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশে ও বাইবেল পাঠে তিনি ক্রমে বুঝিলেন যে বাহ্য কঠোর সাধনের দ্বারা অন্তরের পাপ যায় না। ভক্তিই পরিত্রাণের একমাত্র পথ। পরমেশ্বর মানুষের স্নেহময় পিতা। নরক ভোগের জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়, কিন্তু মানুষকে আনন্দ শান্তি পরিত্রাণ দিবেন বলিয়া ভগবান অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বিশ্বাস

লাভ করিয়া প্রায় দুই বৎসর ব্যাপী অন্ধকারের পরে তাহার অন্তরে আবার শান্তি আসিল।

১৫০৭ খৃঃ লুথার ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর তিনি উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়া গমন করেন। তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি শীঘ্রই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষার আশায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। উইটেনবর্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যশে রাজা নিজেকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বন্ধুগণের একান্ত অনুরোধে এই সময়ে লুথার গির্জ্জায় উপাসনা করিতে সম্মত হন। তাঁহার আশ্চর্য্য বাগ্মিতায় ও উপদেশের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া বহুলোক তাঁহার উপাসনায় যোগদান করিতে লাগিল।

১৫১১ খৃঃ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে রোমে যাইতে হয়। রোম কাথলিকগণের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। ভক্তি-বিনম্রহৃদয়ে লুথার তীর্থযাত্রা করিলেন, কিন্তু রোমের ধর্ম্মযাজকগণের অবিশ্বাস, সংসারিকতা ও জঘন্য জীবন দেখিয়া তিনি ঘৃণা ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন। পৃথিবীর অনেক তীর্থেরই এই দশা।

তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরেই উইটেনবার্গে প্লেগ আসিল। বহুলোক মরিল, বহুলোক পলাইল, কিন্তু লুথার নড়িলেন না। তিনি নির্ভীক।

রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে এইরূপ একটী মত প্রচলিত আছে যে পাপী মানবের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরমেশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি পাপীর অনুতাপও গ্রাহ্য করেন না, তাহাকে ক্ষমাও করেন না। ধর্ম্মযাজকের নিকটে পাপ স্বীকার করিলে তবে ভগবান তাহা গ্রাহ্য করেন এবং ধর্ম্ম যাজক পাপ ক্ষমা করিলেই ভগবানের ক্ষমা করা হইল। অনেক সময়ে পাপীকে ক্ষমা করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজক নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন। ক্রমে ধর্ম্মের আরও অবনতি সহকারে এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল লোক টাকা দিয়া পাপের ক্ষমাসূচক পোপের স্বাক্ষরিত মুক্তিপত্র ক্রয় করিত। নগরে নগরে এই প্রকার মুক্তিপত্র বিক্রয় হইত; যে কেহ ইচ্ছা পণ্য দ্রব্যের মত কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে মুক্তিপত্র বা স্বর্গে যাইবার টিকিট কিনিতে পারিত।

১৫১৭ খৃঃ নূতন পোপ দশম লিও মুক্তিপত্র বিক্রয়ের জন্য জার্ম্মাণীতে লোক পাঠাইলেন। লুথার উইটেনবার্গের বেদী হইতে বজ্রনাদে এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন সরল অনুতাপ ব্যতীত পাপের ক্ষমা নাই। পোপের দস্তখতি টিকিট কিনিলে স্বর্গে যাওয়া যায় না। লুথার নিজে পাপের সহিত যে কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার ফলে তিনি বিলক্ষণ শিখিয়াছিলেন যে পয়সা দিয়া প্রভু পরমেশ্বরের প্রসন্নতা ক্রয় করা যায় না। তিনি বলিলেন যে এরূপ টিকিট কিনিয়া স্বর্গে যাইবার বিশ্বাসে ঈশ্বরের অবমাননা হয়। ইহা সমূহ দুর্নীতির কারণ ও ধর্ম্মজীবনের অনিষ্টজনক। এইবার আগুন জ্বলিল।

পূর্ব্বে পূর্ব্বেও এরূপ টিকিট বিক্রয় হইত ও প্রতিবৎসর ১লা নবেম্বর (All Saints' Day) যাহারা একটী বিশেষ গির্জ্জায় উপাসনা করিতে আসিত রাজা নিজের খরচে তাহাদের প্রত্যেককে একখানি করিয়া স্বর্গে যাইবার টিকিট পারিতোষিকরূপে প্রদান করিতেন। সে বৎসরেও পূর্ব্ববৎ পারিতোষিকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল; কিন্তু ১লা নভেম্বর প্রাতে দেখা গেল যে ঐ গির্জ্জার দ্বারদেশে এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া লুথার একখণ্ড ঘোষণা টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। ৯৫টী কারণ দেখাইয়া তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধির কথা বড় নাই, কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারে এমন সহজ ভাষায় ও সরল যুক্তিতে প্রতিবাদটী লিখিত। এক একটী যুক্তি যেন কুসংস্কারের মাথায় এক একটী মুগুরের ঘা। দুই সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত জার্ম্মানীতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; এক মাসের মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে সে অগ্নি পরিব্যাপ্ত হইল। লুথার নিজেই অবাক। এমন প্রলয় ব্যাপার উপস্থিত হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। স্বর্গে যাইবার টিকিট আর বিক্রয় হয় না। যাহারা

টিকিট কিনিতে আসিতে লাগিল তাহারা টিকিটের পরিবর্ত্তে লুথারের প্রতিবাদের এক এক খণ্ড খণ্ড লইয়া গৃহে ফিরিল। পোপের ক্রোধের সীমাপরিসীমা রহিল না। পোপের তখন অখণ্ড প্রতাপ। রাজা মহারাজা সম্রাট প্রভৃতি তাঁহার কথায় উঠেন ও বসেন, এ হেন পোপের সিংহাসন টলমল করিয়া উঠিল। তিনি লুথারকে "শয়তানের বাচ্চা" বলিয়া গালি দিলেন, ও তাঁহাকে সজ্ঞানে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন! পোপ তাঁহাকে রোমে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। সে আদেশের অর্থ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। কিন্তু সাক্‌সনীর রাজা ও জার্ম্মানীর সম্রাট বলিলেন যে যখন লুথার তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তখন তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া এরূপ আদেশ করা প্রথা বিরুদ্ধ। পোপ সে আদেশ স্থগিত করিয়া লুথারকে বুঝাইবার জন্য রোম হইতে লোক পাঠাইলেন। যিনি আসিলেন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে বুঝি একজন সামান্য পুরোহিতের সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে হইবে। কিন্তু তিনি জার্ম্মানীতে পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন যে ব্যাপার অন্যরূপ— সমগ্র জাতি সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রণবেশে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

তক্ষ শিলা

কিছু দিন পূর্ব্বে মুকুলে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের লুপ্ত নগরী পম্পি সহরের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের এই দেশের কতস্থানে যে কত প্রাচীন নগর নগরী ভূগর্ভে বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন হইয়া আছে, তাহার সংখ্যা নাই। কাব্য, পুরাণ, ইতিহাসে কত স্থানের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু এখন তাহাদের সীমা নির্দ্দেশও করিতে পারা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে কোনও কোনও প্রাচীন লুপ্ত নগরীর সীমা নির্ণয় হইয়াছে, এবং ভূগর্ভ খনন করিতে তাহাদের ভগ্নাবশেষ উদ্ধৃত হইতেছে। এপর্য্যন্ত এই শ্রেণীর যত স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষই সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তক্ষশিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে তক্ষশিলা সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক কার্টিয়াস লিখিয়াছেন, যে তৎকালীন প্রথানুসারে তক্ষশিলার অধিবাসিগণ আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার অনুগামী সৈন্যদিগকে তিন দিন আপনাদের নগরে রাখিয়া বহু যত্ন ও সমাদরে তাঁহাদের আতিথ্যসৎকার করিয়াছিল। আতিথ্যের তৃতীয় দিবস অবসানে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে আপনার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানও তক্ষশিলার উল্লেখ করিয়া ইহাকে উত্তর ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ষ্ট্রাবো, প্লিনী প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে তক্ষশিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট বিন্দুসারের রাজত্বসময়ে তক্ষশিলার অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল, এবং রাজকুমার অশোক তাহাদিগকে পিতৃশাসনে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে তক্ষশিলা জ্ঞান চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। বহুদুর হইতে বিদ্যোৎসাহীগণ জ্ঞানলাভের জন্য তক্ষশিলায় আগমন করিতেন। এমন কি, সুদূর সমরখণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে বৈদেশিক ছাত্রগণের তক্ষশিলায় আগমনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অসাধারণ বৈয়াকরণিক পাণিনি এবং রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত চাণক্যেরও তক্ষশিলার সহিত সংস্রব ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ আপোলিনিয়াস তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন, এবং লিখিয়া গিয়াছেন, যে সেখানকার সূর্য্যদেবতার মন্দিরে আলেকজাণ্ডার ও পোরাসের প্রতিমূর্ত্তি আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চীন পর্য্যাটকগণ তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের ভারতভ্রমণের বিবরণে তক্ষশিলার তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করেন; সে সময়ে তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, সেখানে বহু বৌদ্ধ মঠ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অবস্থান ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, যে এই স্থানে মহাত্মা বুদ্ধ পূর্ব্ব কোনও জন্মে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম তক্ষশিরা হইয়াছিল, এবং তাহারই অপভ্রংশ তক্ষশিলা। ইহা নিশ্চয়ই আধুনিক আখ্যায়িকা। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই তক্ষশিলা নগর প্রসিদ্ধ ছিল; সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী শিলাস্তূপ হইতে ইহার নাম তক্ষশিলা হইয়াছিল; পরে এই নাম হইতে বোধিসত্ত্বের মস্তকদানের আখ্যায়িকা রচিত হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক ফাহিয়ানের সময়ে এবং সম্ভবতঃ তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধ অধিষ্ঠান ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তক্ষশিলার ভগ্নদশা। তিনি লিখিয়াছেন, যে তক্ষশিলায় অনেক স্তূপ ও বিহার আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই জীর্ণ-দশা প্রাপ্ত। তৎকালে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত অল্পসংখ্যক বৌদ্ধসন্ন্যাসী তথায় বাস করিবেন। তিনি ভারতবর্ষ আগমন পথে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন তক্ষশিলায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তৎপরে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে প্রত্যাগমন সময়ে অনেক দিন তক্ষশিলায় থাকিয়া গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই ক্রমে এই প্রাচীন নগরী লুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস, কাব্য, ভ্রমণ বৃত্তান্তাদিতে আর তক্ষশিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে লোকে ইহার অস্তিত্বও ভুলিয়া গিয়াছিল। বিগত শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রন্থাদির পুনরালোচনার সঙ্গে তক্ষশিলার স্মৃতির পুনরুদ্রেক হইয়াছে; কিন্তু কোথায় যে তক্ষশিলা অবস্থিত ছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার নির্দ্দেশ হয় নাই। পরে বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মেজর কানিংহাম ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে রাউলপিণ্ডি সহরের নিকটে কয়েকটী প্রস্তরস্তূপকে তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রধানতঃ চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়াই কানিংহাম তক্ষশিলার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা কানিংহামের এই মত গ্রহণ করিলেও ইতিপূর্ব্বে তাহার অকাট্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বিগত বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট কানিংহামের নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ পাইয়াছেন, এবং এক্ষণে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে, যে এই স্থানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন তক্ষশিলা নগরী অবস্থিত ছিল।

এই স্থানটী পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। ইহার কিয়দংশ পঞ্জাবের সীমান্তর্ভুক্ত এবং কিয়দংশ উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। লাহোর হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, ঠিক তাহার পার্শ্বে রাউলপিণ্ডি সহর হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার মধ্যে স্থানটী অবস্থিত। ইহারই নিকটে নর্থওয়েষ্ট রেলওয়ের সরাই কালা নামক ক্ষুদ্র ষ্টেশন। তক্ষশিলা দেখিতে যাইতে হইলে সরাইকালা ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া তাহার পরে হাঁটিয়া যাইতে হয়। চারিদিকে পাথর ও মাটীর ঢিপ! তবে সৌভাগ্যের বিষয়, বেশী পথ হাঁটিতে হয় না। ন্যূনাধিক আধ মাইল চলিলেই একটী ঢিপির উপরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্য্যালয় ও কর্ম্মচারীর বাসের জন্য এক খানি বাঙ্গলা। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, যে এই ঢিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তক্ষশিলা এই কারণে বলিতেছি, যে দিল্লীর মত তক্ষশিলাও একটী নগর ছিল না। যুগের পর যুগ তক্ষশিলা নামে একটীর পর একটী নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, হিন্দু দিল্লী কুতুবউদ্দিনের দিল্লী, খিলিজীদের দিল্লী, তোগলকদের দিল্লী, মোগলদের দিল্লী যেমন পৃথক, তেমন একই নামে ভিন্ন ভিন্ন তক্ষশিলা ছিল। আবার দিল্লীর মত তক্ষশিলাতেও নগর ক্রমে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে সরিয়া গিয়াছিল। যে স্থানে এখন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের আফিস হইয়াছে,

সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগর ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে নগরটী সরিয়া উত্তরের দিকে গিয়াছিল; অর্থাৎ উত্তরের দিকে লোকের বাসস্থান বিস্তৃত হইয়াছিল, অপরদিকে দক্ষিণে প্রাচীন গৃহগুলি পরিত্যক্ত হওয়ায় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। এখন যত গুলি ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি প্রায় ছয় মাইল ভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব দক্ষিণের ভগ্নাবশেষটী বীরস্তূপ নামে অভিহিত। ইহা একটী প্রকাণ্ড স্তূপ, অনেকদূর পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট উচ্চ। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারীরা সর্ব্বপ্রথমে এইস্থান খনন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে কোনও মন্দির বা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় নাই; এখান হইতে কেবল বহুসংখ্যক পুরাতন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলির অধিকাংশই তাম্র নির্ম্মিত; অল্প রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে এবং একটী মাত্র স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি সাধারণতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব ও পশ্চাৎকালের। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ এই স্থানে আর খনন না করিয়া এখানে আফিস ইত্যাদি করিয়াছেন। তাহার একটী ঘরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান খুদিয়া যে সমুদয় কৌতুহলজনক বস্তু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া রক্ষিত হইয়াছে; পরে সেগুলির বিবরণ দিতেছি।

বীরস্তূপের কিছু উত্তরে আর একটী স্তূপ, তাহার নাম শ্রীকাপ (Sir cup)। এইখানে এখন খনন কার্য্য চলিতেছে। প্রথমে একটী স্থান দেখিলাম, সেখানে একটী বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। বাড়ীটীতে অনেক ছোট ছোট ঘর ছিল মনে হইল। এখন কেবল ঘরের ভিত্তিগুলি আছে; উপরের অংশ কিছুমাত্র নাই। এসমুদয় মাটীর মধ্যে প্রোথিত ছিল। উপরে অনেক মাটী সরাইলে পর এই ভিত্তি বাহির হইয়াছে। ঘরগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল; কিন্তু চুন বা সুরকি দিয়া গাঁথা নয়।

ইহার কিছু উত্তরে একটী স্থান খুদিয়া একটী সুন্দর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। এটীরও ভিত্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে; উপরের অংশের কোন চিহ্নও নাই। কিন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই উচ্চঅঙ্গের শিল্পকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরটী প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল; পাথরগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া কাটা; চারি কোণে অতি সুন্দর গোল থাম; স্পষ্টই বোধ হয় যে ইহার গঠনকার্য্যে গ্রীক সৌধশিল্পের ছায়া আছে। একটী উল্লেখযোগ্য কথা এই যে এখানে ভগ্নাবশেষের মধ্যে বা প্রাচীর গাত্রে কোনও মনুষ্য প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। এই মন্দিরটীর ভিত্তির গাত্রে স্থানে স্থানে পাখীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের মন্দির স্তূপ প্রভৃতিতে যে বুদ্ধদেবের বা হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরটীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাহার কোনও চিহ্ন দেখিলাম না। ইহা যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; অথচ এখানে কোনও দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নাই। মন্দিরের চারিদিকে আঙ্গিনার অপর পার্শ্বে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘরের ভিত্তি রহিয়াছে। বোধ হয়, এই গুলিতে মন্দির সংসৃষ্ট লোকেরা বাস করিত।

আরও কিছু উত্তরে আর একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বের মন্দিরটী অপেক্ষা আয়তনে বড়, কিন্তু ইহার শিল্পকার্য্য পূর্ব্বটীর অপেক্ষা হীনতর। ইহারও কেবল ভিত্তি অবশিষ্ট আছে; উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানেও কোন প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। শ্রীকাপস্তূপে আপাততঃ এই তিনটী ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে।

শ্রীকাপ হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে আর একটী স্থান খনন করা হইয়াছে! সেখানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এই বাড়ীটী যে কি ছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না; মন্দির মনে হইল না। বরং রাজপ্রাসাদের বহির্ব্বাটী বলিয়া বোধ হইল। বাড়ীটী একটী ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। দক্ষিণদিকের বারান্দায় প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড কয়েকটী স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এই বাড়ীটী একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। থামগুলির অনেক অংশ বেশ ভাল অবস্থায় আছে। প্রাচীন গ্রীক সৌধে যে প্রকার থাম দেখিতে পাওয়া যায়, এগুলি ঠিক সেই প্রকারের। এগুলি যে গ্রীক সৌধশিল্পের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গঠন কার্য্যও বেশ পরিপাটী। বারান্দার পশ্চাতে একটী প্রকাণ্ড হল, তাহার অপর পার্শ্বে আর একটী বারান্দা।

তক্ষশিলার এই অংশটী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এখানে যে সমুদয় বস্তু পাওয়া ও যাইতেছে, শুনিলাম সেগুলি পেশোয়াবের যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে।

এখান হইতে ফিরিয়া দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রায় দুই তিন মাইল গিয়া আর একটী স্থানে উপস্থিত হইলাম; এই স্থানটীর নাম চীরটোপ। এখানে একটী প্রকাণ্ড টোপ বা বৌদ্ধস্তূপ আছে। তাহার মধ্যে একটী ফাট আছে, তদনুসারে ইহার নাম হইয়াছে চীর টোপ। এই টোপটী একেবারে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া যায় নাই। মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে অগ্রভাগটী দেখা যাইত। এখন সমুদয় টোপটী খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে। মধ্যস্থিত বৃহৎ টোপটীর চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট টোপ বাহির হইয়াছে। এই সকল টোপে অনেক বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ হইতে যত মনুষ্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার সমুদয় চীরটোপ হইতে খুদিয়া তোলা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে মূর্ত্তি গঠনের প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল না। সেইজন্য তক্ষশিলার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব বা অপর কোনও দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় না। কেবল অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ চীরটোপেই বুদ্ধমূর্ত্তি বুপাওয়া যায়। এখানে দুইটী অতি প্রশস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও রহিয়াছে; কিন্তু দুইটীরই মস্তক নাই। এই মূর্ত্তি দুইটী এত বৃহৎ যে তাহা সরান দুঃসাধ্য বা অসম্ভব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল তাহার সংখ্যাই নাই। তাহার অধিকাংশই শিমলা প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হুয়েনসাং যে তক্ষশিলা দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় চীরটোপের তক্ষশিলা। চীরটোপটী নগরের প্রান্তভাগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসস্থান ছিল বলিয়া মনে হয়। এখানকার প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপগুলি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। প্রাচীন তক্ষশিলা ধ্বংশ হইয়া গেলেও এখানে মনুষ্যের বসতি ছিল।

এখন তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ মধ্যে যে সমুদয় বস্তু পাওয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রাচীন মুদ্রাগুলিই ঐতিহাসিকদের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। তক্ষশিলার সকল স্থানেই অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার মধ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা অতি বিরল; অধিকাংশই তাম্রনির্ম্মিত। তক্ষশিলার যাদুঘরে তাহার কতকগুলি রক্ষিত হইয়াছে। যাদুঘরে রক্ষিত জিনিসগুলির মধ্যে আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুহলজনক মনে হইল মাটীর কলসী হাঁড়ী প্রভৃতি গৃহসামগ্রীগুলি। সেগুলি দেখিয়া যেন সম্প্রতি বাজার হইতে আনীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দুই হাজার বৎসরে এবিষয়ে আমাদের দেশে কত সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে! দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলার লোকেরা যে প্রকার মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এখনও ঠিক সেইরূপ তৈজসপত্র ব্যবহৃত হইতেছে। যাদুঘরে দুইটী প্রকাণ্ড জালাও রহিয়াছে। কর্ম্মচারীরা না বলিলে কখনই মনে করিতে পারিতাম না যে এইগুলি দুই হাজার বৎসরের পুরাতন জিনিস। পিতল ও তামার জিনিসও দেখিলাম, কিন্তু সেগুলি খারাপ হইয়া গিয়াছে। রঙ্গীন কাচও আছে; তাহাতে বুঝা যায় যে সেকালে ভারতবর্ষে রঙ্গীন কাচের প্রচলন ছিল। মোটের উপরে স্থানটী অতিশয় কৌতুহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ। সুবিধা হইলে সকলেরই ইহা দেখা উচিত।

সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ এই প্রবন্ধটী যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা প্রমাণ করিতে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। যিনি ইচ্ছা করেন তাঁহার আপনার চরিত্র আলোচনা কবিলেই বুঝিতে পারেন। চরিত্রবান উদারচেতা সাধুর দর্শন তাঁহার নিকটে উপবেশন ও তাঁহার সহিত আলাপে মন পবিত্র ও উন্নত হয়; সাধু মহাত্মাগণের পুণ্যচরিত শ্রবণে তাঁহাদিগের আচরিত মহৎকার্য্য অনুকরণে ইচ্ছা জন্মে এবং তাঁহাদিগের উদারচরিত মহিমায় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়। যাঁহাদিগের চরিত্র শ্রবণে হৃদয়ে এমন বিমল আনন্দের সঞ্চার হয়, তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভ করিতেপারিলে হৃদয় যে মহৎভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের দেশের পুরাণ শাস্ত্র ও ইতিহাস স ধুগণের পুণ্য কাহিনীতে পূর্ণ। পুরাণে উক্ত আছে সাধু মহাত্মাগণের আগমনে তীর্থ পবিত্র হয়। সাধুগণ জীবের হিতসাধনের জন্য তীর্থ পর্য্যটন করেন। যাঁহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরের সত্বা অনুভব করেন তাঁহারা যথার্থ সাধু। ইঁহারাই ভগবানের মঙ্গলশক্তি। ইহাঁদের দ্বারা প্রভু পরমেশ্বর জগতের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনে ও তাঁহার অলৌকিক প্রেম-প্রভাবে অনেক মহাপাপীর হৃদয়ে পবিত্র ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। অনেক মহাপাপী সাধুপথ আশ্রয় করিয়াছিল। দুইজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী আপনাদের বিপুল ধনসম্পত্তি পদসম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা রূপসনাতন নামে পরে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই সনাতন যখন বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন যমুনায় স্নান করিতে গিয়া একখানি স্পর্শমণি পাইলেন। স্পর্শমণি যে ধাতুকে স্পর্শ করে তাহাই সুবর্ণ হইয়া যায় বলিয়া প্রবাদ আছে। স্পর্শমণি পাইয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এই স্পর্শমণি যে ধাতু স্পর্শ করিবে তাহাই সুবর্ণ হইয়া যায়; না জানি প্রভু আসিয়া যাহাকে স্পর্শ করেন সে কি অপূর্ব্বভাব ও মহত্ত প্রাপ্ত হয়; যাহা হউক এই মণিতে আমারত কোন প্রয়োজন দেখি না। পরে যদি কোন কাজে লাগে এই ভাবিয়া বালুকার নিম্নে পুতিয়া বাখিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী মানকব নামক স্থানবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য-ক্লেশ দুর করিবার উদ্দেশে কাশীতে গিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। কঠিন তপস্যা করিয়া যখন তাঁহার মন বশীভূত হইল তখন একদিন তিনি বোধ করিলেন যেন মহাদেব তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন তুমি বৃন্দাবনে গিয়া সনাতন গোস্বামীর নিকট প্রার্থনা কর, মহামূল্য ধন প্রাপ্ত হইবে। তিনি তাহাই করিলেন; সনাতনের নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি প্রথমতঃ বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহাকে দান করিবার মত তাঁহার কি ধন আছে অথচ দেবতার বাক্যইবা কিরূপে মিথ্যা হইবে? সহসা তাঁহার স্পর্শমণির কথা স্মরণ হইল তখন তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান দেখাইয়া কহিলেন ঐ স্থানে অন্বেষণ করুণ বালুকার নিম্নে একখণ্ড স্পর্শমণি পাইবেন। ব্রাহ্মণ প্রথমবার খুঁজিয়া কিছুই পাইলেন না, সনাতনের নিকটে আসিয়া কহিলেন আমি ত খুঁজিয়া পাইতেছি না, আপনি দয়া করিয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিন।" সনাতন কহিলেন, "ঠাকুর আমার অপরাধ লইবেন না। আমি এইমাত্র স্নান করিয়া উঠিয়াছি উহা স্পর্শ করিলে আমাকে আবার স্নান করিতে হইবে। সুতরাং আপনিই একটুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়া লউন।" ব্রাহ্মণ পুনরায় খুঁজিয়া স্পর্শমণি পাইলেন।

অন্নহীন দরিদ্রের পক্ষে স্পর্শমণি লাভ করা যে কি আনন্দের কথা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্রাহ্মণ এত দিন পরে সেই অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার ধন পাইয়া আনন্দে অধীর চিত্তে গৃহঅভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে কত সুখের চিত্র তাঁহার মানস-পটে একে একে উদিত হইতে লাগিল। অগণিত ধন অপরিমিত সুখ তিনি এই স্পর্শমণির দ্বারা লাভ করিবেন। এই

সকল সুখের চিন্তায় মগ্ন হইয়া অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার চিন্তা আবার ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। তিনি মনে ভাবিলেন এই যে সাধু সনাতনকে দেখিলাম ইনিত আমারই মত মানুষ, ইঁহার শরীরের অভাব ও সুখ দুঃখ বোধের শক্তি ত আমারই মত। উচ্চ রাজকর্ম্মচারী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কত সুখ আরামে দিন কাটাইয়াছেন, আজ তিনি কেন এত সুখ ও ধন ত্যাগ করিলেন? আর এই স্পর্শমণি যাহা পাইবার জন্য পৃথিবীর সম্রাটেরা লালায়িত তাহা লাভ করিয়া তিনি আমার মত এক অপরিচিত ব্যক্তিকে অনায়াসে দান করিলেন। সনাতন কি উন্মাদ? তাঁহাতে ত উন্মাদের কোন চিহ্ন দেখিলাম না; তবে এই স্পর্শমণি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ধন তাঁহার আছে। যাহার জন্য তিনি ইহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছেন। তবে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া যাই, বোধ হয় তাহা লাভ করিবার জন্যই মহাদেব আমাকে সনাতন গোস্বামীর নিকট যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া সনাতনের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন, কহিলেন আমি এই স্পর্শমণি চাহি না। যে ধনের অধিকারী হইয়া আপনি এই স্পর্শমণিকে তুচ্ছ বোধ করিয়াছেন উপযুক্ত জ্ঞান করিলে আপনি আমাকে তাহাই দান করুন। সনাতন কহিলেন এই স্পর্শমণিতে আসক্তি থাকা পর্য্যন্ত তোমার তাহা লাভ হইবে না! এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি তৎক্ষণাৎ যমুনার জলে ফেলিয়া দিলেন। তখন তাঁহারা দুইজনে আনন্দে পুলকিত হইয়া ঈশ্বরের নাম গান করিয়া বিহ্বল চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সনাতনের স্পর্শে নূতন জীবন লাভ করিলেন।

ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে তাহা ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইবে। সেইজন্য চরিত্রবান সাধুদিগের সঙ্গ লাভ একান্ত আবশ্যক। তাঁহাদিগের জীবনের শিক্ষা মনে মনে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে অল্প তাঁহাদের ভাব প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল,

১। চেয়ার।

২। মেঘ।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীইন্দ্রভূষণ বীদ, শ্রীহিমাংশুকুমারবসু, শ্রীসুশীলচন্দ্র পালিত, শ্রীফণিভূষণ ঘোষ, শ্রীসুনীলচন্দ্র পালিত, শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ বসু, শ্রীশচিন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীশচীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভাবতী ঘোষ, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল, কুমারী ঊষাবালা বিশ্বাস, কুমারী প্রফুল্লমুখী চক্রবর্ত্তী, কুমারী আশা ও সুধা দত্ত, শ্রীমতী স্নেহলতা সরকার, শ্রীললিতকুমার দে, শ্রীরাধাকান্ত পাল, শ্রীজগদীশচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীবিমলাকান্ত সরকার, শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রকেশরী বন্দ্যোপাধ্যায়, N. Das Gupta, Esqr., A. Pradhan, Esqr. শ্রীসুধাংশুকুমার মিত্র, শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দাসগুপ্তা, শ্রীগোপালচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীমতী বিভাবতী দাসগুপ্তা, শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅরুণবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, M. N. Abul Hasnat, Esqr. শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীগোলাম জব্বার, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীহারকুমারী দত্ত, শ্রীমতী পুষ্পমালা চন্দ্র, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুনারায়ণ মুন্সী, Miss B. Banerjee, শ্রীবিজেতা চৌধুরী, সম্পাদক, ছাত্রসভা—কলমা, ঢাকা, শ্রীনীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

নূতন ধাঁধা।

১। যেথা যাও নিয়ে যাবে, নিজে নাহি চলে,
পড়ে থাকে পদতলে, কথা নাহি বলে।

২। পুচ্ছতুলি উর্দ্ধদিকে মুখে হেঁটে যায়,
একের মনের কথা অপরে জানায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেলখোসের এত আদর কেন ?

একজন ভদ্রলোক তাঁহার জনৈক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, এসেন্স লইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে দেলখোসের কথা বলে, উহার এত আদর কেন ? বন্ধু উত্তর দিলেন, এ অতি সহজ কথা।

প্রথমতঃ—রুমালে ব্যবহারের পক্ষে ইহা খুব বেশ উপযোগী।

দ্বিতীয়তঃ—গন্ধটী অতি মিষ্ট, আবার অধিকক্ষণ স্থায়ী. রুমালে দিতে দিতেই গন্ধ উড়িয়া যায় না। ব্যবহারের পর অন্ততঃ সাতদিন গন্ধ থাকে।

তৃতীয়তঃ—এসেন্সটী মজলিস ভরপুর করিবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

চতুর্থতঃ—গুণে বিলাতীর সমকক্ষ হইয়াও, তাহাপেক্ষা অনেক সুলভ।

দেলখোস সম্বন্ধে দেশের নেতাদিগের মতামত :—

সুবিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন :—"আমি এসেন্সগুলি নিজে ব্যবহার করিয়াছি, যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমি নিঃসঙ্কোচে সাধারণকে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

লালা লাজপৎ রায়, লাহোর, বলেন :—"আমি এইচ বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি, এবং এগুলি অতি উত্তম জিনিস মনে করি। বিলাতী জিনিস অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে করি না।"

লালমোহন ঘোষ বলেন :—"মিঃ বসুর সুগন্ধি দ্রব্যাদি সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সাদরে ব্যবহৃত। আমি নিজে ব্যবহার করিয়াছি এবং বলিতে পারি এসেন্সগুলি সাধারণের সহানুভূতি লাভের যোগ্য।

বামড়ার রাজা সচ্চিদানন্দ দেব বলেন :—"বসু মহাশয়ের 'দেলখোস' বিলাতী অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে, আমি প্রত্যেককে দেলখোস একবার ব্যবহার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আপনারা অন্য বাজে এসেন্স কিনিবার পূর্ব্বে এ বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

দেলখোস ষ্ট্যাণ্ডার্ড—১৲, দেলখোস রয়েল—২॥০, দেলখোস কাট-গ্লাসশিশি—৩৲

পারফিউমার,

এইচ বসু, দেলখোস হাউস, কলিকাতা

৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট,